আলোর দিশারী

আলোর দিশারী

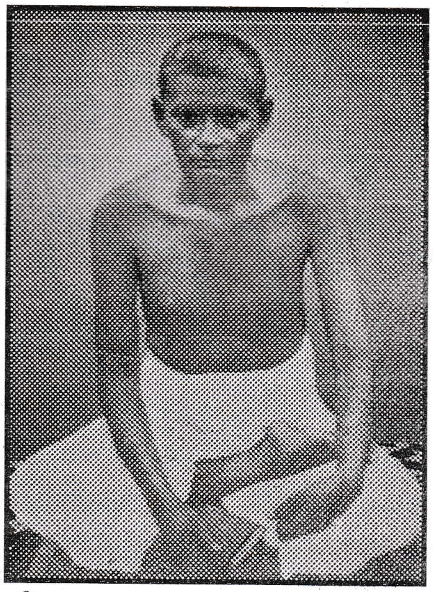

৺ মুরারী মোহন দাস   পিতা - ৺ আশুতোষ দাস

প্রথম প্রকাশ — [redacted]
১৫ই আগষ্ট ২০১৬
৩০শে শ্রাবণ ১৪২৩
প্রকাশক ডাঃ অর্ঘ্য দাস
মোঃ - ৯৭৪৮০৯৮৯২০
মদারাট মুখার্জী পাড়া
দক্ষিণ ২৪ পরগনা
মুদ্রণ ঃ সিসকন গ্রাফিক্স, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
ফোন ঃ ৯৮৩১৯৫১২৮৭

উৎসর্গ
পরম পিতা ও মাতার শ্রীচরণে

প্রথম পর্ব

প্রকাশকের নিবেদন –
ভূমিকা –
স্বর্গীয় মুরারী মোহন দাস
কিভাবে গুরুর সান্নিধ্যে এলেন।

দ্বিতীয় পর্ব

আলোর দিশারী

// প্রকাশকের নিবেদন //

জয়গুরু

অনেকদিন পর দাদুকে নিয়ে লিখতে বসে কত কি যে স্মৃতি মনে আসছে, তা সব লেখায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। আমি যখন থেকে দেখেছি, বয়স তখন প্রায় আশি ছুঁই ছুঁই; কিন্তু কি অসাধারণ হাতের কাজ। কি দারুণ নিপুণতায় আমার বই, খাতা বাঁধিয়ে দিতেন। কত রকমের মজার খেলনা বানিয়ে দিতেন কাগজ আর সুতো দিয়েই। সেই বয়সে ছবি আঁকার মতো দৃষ্টিশক্তি না থাকলেও, বাড়িতে থাকা পুরানো পেন্টিংগুলোয় রং তুলির অসামান্য কারুকার্য চোখ ধাঁধিয়ে দিত। খেলায় বিশেষতঃ ফুটবলের প্রতি ছিল তাঁর অমোঘ আকর্ষণ। সেই বয়সেও রাত জেগে বিশ্বকাপ ফুটবলের ম্যাচ দেখতেন।

তাঁর মুখেই শুনেছি যৌবনে মদারাট ক্লাবের হয়ে ব্যাকে খেলতেন। তাঁকে কাটিয়ে বল নিয়ে যাওয়া মুশকিল ছিল। বইয়ের প্রতি ও ছিল তাঁর অগাধ টান, কলেজ স্ট্রীট থেকে কম দামে Second hand বই কিনে নিজের বাড়িতেই বানিয়ে ফেলেছিলেন একটা ছোটোখাটো Library, শুধু তাই নয়, বইগুলোর জন্য একটি ডাইরীতে বানিয়েছিলেন বর্ণানুক্রমিক পুস্তকসূচী। তিনিই অনেক অনুসন্ধান করে বানিয়েছিলেন আমাদের বংশের বংশতালিকা। একটি ডাইরীতে লিখে রাখতেন আত্মীয়দের জন্ম, মৃত্যুর দিনক্ষণ। একটা বয়স অবধি নিয়মিত দিনলিপি লিখতেন, পরে তাঁর মৃত্যুর পর সেসব লেখা পড়ে বারবার মনে হয়েছে, 'ভগবান যদি আমাকে এরকম বলিষ্ঠ-নির্ভীক লেখার সাহস দিতেন'। আরেকটা জিনিস না বললে তাঁর সম্পর্কে লেখা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে, তা হল তাঁর গুরুদেব শ্রী শ্রী ঠাকুরবাবার প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস। অসুস্থ শরীর নিয়ে ও সারাদিন নাম জপ করতেন।

তবে শেষ দিকটায় শীতকালে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টে ভুগতেন Deriphyllin Injection দিতে হোত। যখন বাড়ি থেকে হোস্টেলে যেতাম, দাদু বলতেন "দাদুভাই এবার হয়ত আর দেখা হবে না।" সেই আশঙ্কা সত্যি করে দিয়ে এক শীতকালে স্কুলের পরীক্ষা দিয়ে জানতে পারলাম আমার প্রিয় মানুষটি আর নেই, হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছিলাম সেদিন — দাদুর সাথে আমার আর শেষ দেখা হল না। "দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না -

সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।"

আমি খুব ভাগ্যবান যে দাদুকে খুব কাছ থেকে দেখেছি, অনেক আশীর্বাদ পেয়েছি, অনেক স্নেহ ও পেয়েছি। ও আর একটা কথা একদমই ভুলে গেছি - তাঁর Sence of humour. সকালে উঠে দাঁত মাজার সময় আমায় বলতেন - "যে হাতি জ্যান্তে লাখ টাকা, মলেও লাখ টাকা, সেই হাতি দাঁত মাজেনা-আর তুমি দাঁত মাজছ দাদুভাই।" আরো অনেক মজার গল্প বলতেন - তিনি আর ঠাকুমা মিলে একবার হাজারিবাগে (অনেক বাঘ নাকি সেখানে) মতিহারী তামাক নাকি জ্বালিয়ে বাঘ তাড়িয়েছিলেন - এত সুন্দর করে গল্পগুলো বলতেন — অনেকদিন অবধি আমি এগুলো সত্যি বলে ভাবতাম।

১৯১৭ সালের আগষ্ঠ মাসে যে মহান প্রাণের জন্ম হয়েছিল শ্রী আশুতোষ দাস ও শ্রীমতী নগেনবালা দেবীর কোলে, ২০০২ সালের ডিসেম্বরে চিরতরে হারালাম তাঁকে, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় হয়ে থাকল তাঁর অসামান্য সব আঁকা, ভাস্কর্য এবং লেখা, আর সবার মনে জ্বলে রইল তাঁর চিরদৃপ্ত অদমনীয় জীবনদীপের প্রোজ্জ্বল জ্যোতি। এ বছর তাঁর শতবর্ষ পূর্ণ হতে চলেছে। তাই সেই উপলক্ষ্যে তাঁর সকল পুত্র কন্যা, নাতি নাতনিদের সামান্য প্রয়াস - তাঁর স্মৃতিচারণা এবং স্মরণ ও মননের উদ্দেশ্যে এই বই। আর একবার ঠাকুরবাবাকে স্মরণ করে বলতে চাই — তাঁর দেওয়া বিশ্বাসের আশীর্বাদ দাদুর সারা জীবনের পাথেয় হয়ে ছিল।

"পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কিরে হায়।
ও সে চোখের দেখা, প্রাণের কথা, সে কি ভোলা যায়।

ডাঃ অর্ঘ্য দাস
বারুইপুর

প্রথম পর্ব

ভূমিকা

শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় শ্রী মুরারী মোহন দাস দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর থানার অন্তর্গত মদারাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঠাকুর বাবার দীক্ষিত

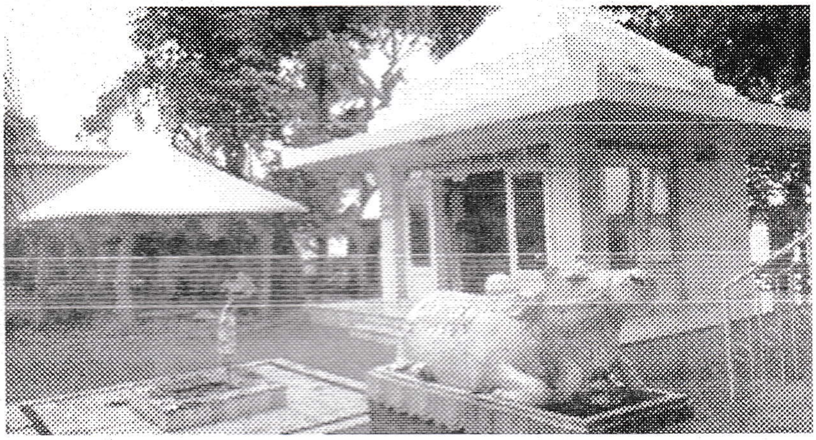

কোন্নগর আশ্রম, সমাধি মন্দির

সন্তান। আমার জ্যেষ্ঠ / জ্যেষ্ঠা গুরু ভাইবোনেদের কাছ থেকে জেনেছি শ্রী শ্রী ঠাকুর বাবাই বেনীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকনাথ ব্রহ্মচারী তাঁর গুরুভাই। এনাদের গুরু ছিলেন ভগবান গাঙ্গুলী। এঁদের জন্মস্থান কাঁকড়া কচুয়া গ্রাম। পরে ভারতের দুই দিকপাল মহাসাধক মাধবানন্দ গিরিমহারাজ (মৌনীবাবা, উজ্জয়িনী) ও শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী (বারদীর ব্রহ্মচারী) নামে খ্যাতি লাভ করেন। বেনীমাধব ব্রহ্মচারী ২৫০ বছরের অধিক দেহে ছিলেন।

তিনি ঠাকুর বাবার সঙ্গ করে যে বাণীগুলি সংগ্রহ করেছিলেন এবং তাঁর ভক্ত, শিষ্যদের কাছ থেকে যে ঘটনাগুলো শুনেছেন তা তাঁর ডাইরিতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি যা তাঁকে আনন্দের জগতে নিয়ে গেছে। তাঁর যুগে মদারাট গ্রামে শিক্ষার আলো প্রবেশ করেনি বললেই চলে। দু'একটা পরিবারের ছেলেরা পড়াশোনা করত। মেয়েরাতো নয়ই। গ্রামের কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশ দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠেছিলেন। মানুষে মানুষে বিভেদের অন্ত ছিল না। বর্ণ বিদ্বেষ আর জাত্যাভিমান তাঁর কোমল হৃদয়ে নাস্তিকতার বীজ বপন করেছিল। যে জগতে ছিল Radical Party -র

মাধবানন্দগিরি মহারাজ

নেতা এম. এন. রায়ের মত বিদ্রোহী মানুষের হাতছানি। এই হাতছানি যৌবনের রক্তকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সেই বিদ্রোহের আগুনে পুড়তে পুড়তে তিনি হয়ে উঠেছিলেন পিছিয়ে পড়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামের এক প্রতিবাদী পুরুষ। তাঁর মত কয়েকজনের চেষ্টায় এই গ্রামে এসেছিল আমূল পরিবর্তন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁর হৃদয় ছুঁয়ে যেত।

'মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়াছ দূরে,
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।'

তাঁর হাত ধরেই আমাদের বাড়ীতে খেলার জগৎ ও শিক্ষার জগৎ গড়ে উঠেছিল। তাঁর আদর্শ ছিল সততা, নির্ভীকতা ও বলিষ্ঠতা। তাঁর সহধর্মিনী শ্যামাশশী দাসকেও তিনি নানা ধরনের শিক্ষার ভাবনায় ভাবিত করেছিলেন। আমিও তাঁর পরশে ও সাহচর্যে মেয়ে হিসাবে উচ্চশিক্ষার পথে পা রেখেছিলাম। তাঁর ভাবনায় ভাবিত হয়ে দেশ বিদেশের বহু সাহিত্যিকের রচিত কথা ও কবিতার সংস্পর্শে এসেছি। তিনি শিখিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের পথ ধরে এগিয়ে চলা। এই গ্রামের গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে তাঁর ভূমিকা কম ছিল না। তাঁর বাড়িকেও ছোট্ট একটা গ্রন্থাগারের রূপ দিয়েছিলেন।

এই দীর্ঘ জীবনের পথ চলার কোন এক বাঁকে এসে তাঁর এক নতুন জীবনের পথ চলা শুরু। তিনি কখন যে নাস্তিকতার জীবনকে পিছনে ফেলে আস্তিকতার চরম জগতে প্রবেশ করলেন তা তিনি নিজেও বুঝতে পারলেন না। উজ্জয়িনীর কালজয়ী একজন পরম পুরুষের সান্নিধ্য তাঁর জীবনতটে এক নতুন আলোকের সঞ্চার করল। তাঁর প্রার্থনা ছিল জীবনে আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের জন্ম হোক। এই প্রার্থনা বোধহয় সত্য সত্যই ভগবানের কানে পৌঁছেছিল। পরের জীবনে তিনি এতটাই ধর্মীয় ভাবনায় ভাবিত হয়েছিলেন যে ঠিকাদারী কাজ করতে পারতেন না। তখন সারা দিন-রাত তাঁর ধ্যান, জপেই সময় কাটত। অনেক অলৌকিক ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছিল। তার

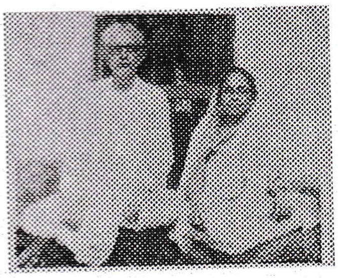

ঁ মুরারী মোহন দাস ও
তাঁর পত্নী ঁ শ্যামাশশী দাস

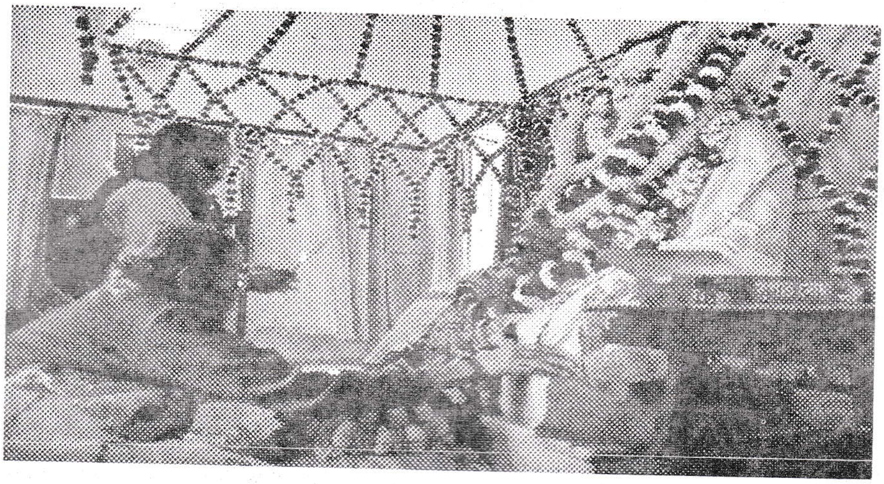

হুগলী আশ্রম

ছোট্ট একটা উদাহরণ সেই কালজয়ী পরম পুরুষের আশীর্বাদে তাঁর এক দুরূহ শারীরিক ব্যাধি থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন।

একদিন তিনি তাঁর কয়েকটি খাতা আমায় দিয়ে বলেছিলেন 'এগুলি তোকে দিলাম'। বিভিন্ন খাতায় বিভিন্ন মহাপুরুষের বাণী লেখা ছিল। এতদিন ধরে খাতাগুলো সযত্নে রেখে দিয়েছি। এখন মনে হচ্ছে ওনার খাতা থেকে ঠাকুরবাবার সম্বন্ধে যা লেখা আছে তা প্রকাশ করলে কেমন হয়? ঠাকুর বাবার স্মৃতিচারণ হবে। তাঁর ভক্ত ও অনুরাগীরা অনেক অজানা কথা জানতে পারবে সেই বাসনা নিয়ে ঠাকুর বাবার কাছে প্রার্থনা জানালাম। তাঁর আশীর্বাদে যেন বই আকারে প্রকাশ করতে পারি। যদি লেখাগুলি পড়ে তারা আনন্দ পায় তবেই এই প্রয়াসের সার্থকতা। সবাই তো আনন্দ চায়। 'আনন্দই ব্রহ্ম, আনন্দ সাগরে অবগাহণ করলে জীবই শিব হয়ে যায়'। অনেকের অনুপ্রেরণা ও আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করেছি। না হলে হয়ত বইটি প্রকাশ হত না।

আমি অতি সাধারণ, আমার ক্ষমতা সীমিত। আমার লেখায় যদি কোন ত্রুটি থেকে থাকে তাহলে মার্জনা করবেন।

জয়গুরু
বিনীতা
রেবা দাস, বঙ্গাব্দ ১৪২৩

নাস্তিক্যবাদের মরুভূমিতে অনেকদিন বিচরণ করেছি। ফলে মনে এতটুকু শান্তি নেই। আছে শুধু এক জ্বালা। সে জ্বালা প্রকাশের ভাষা পাওয়া শক্ত। আমার জীবনের সাথী হল এক অতৃপ্তি। ইন্দ্রিয় পথে কিছুক্ষণের বিরতি ঘটে। আবার তার প্রকোপ ভীষণ।

ইংরাজী ১৯৬৪-৬৫ সালে এইরকম আমার মানসিক অবস্থায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠের ইচ্ছা মনে জাগে। বৈষ্ণব সাহিত্য পাঠকালে প্রেম শব্দটি আমার কাছে দুর্বোধ্য লাগত। আবার যখন রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' এবং 'শান্তিনিকেতন' পাঠ করি, দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরের প্রতি কি গভীর বিশ্বাস। মনে হল এ এক অন্তরের উপলব্ধি। এর মধ্যে নেই এতটুকু অসত্য। তাঁর কাছে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ সত্য। নিজের মনে ভাবি এর কিঞ্চিদাংশ বিশ্বাস যদি আমার থাকত, তাহলে আমার হৃদয় আনন্দে ভরপুর হত। আমাকে এই মরুভূমির মধ্যে বিচরণ করতে হত না, এক সময়ে হরিনাম করতে মনে ইচ্ছা জাগল। সদা সর্বদা মনে মনে হরিনাম করতে লাগলাম। এরপর রাতে বালিশে মাথা রাখলেই হরিনাম দূর হতে ভেসে আসত। সারা রাতই হরিনাম শুনতাম। রামনগরের নিতাইবাবুর সঙ্গে রাজনৈতিক জীবনে আলাপ। বহুদিন রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু আমাদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব গড়ে

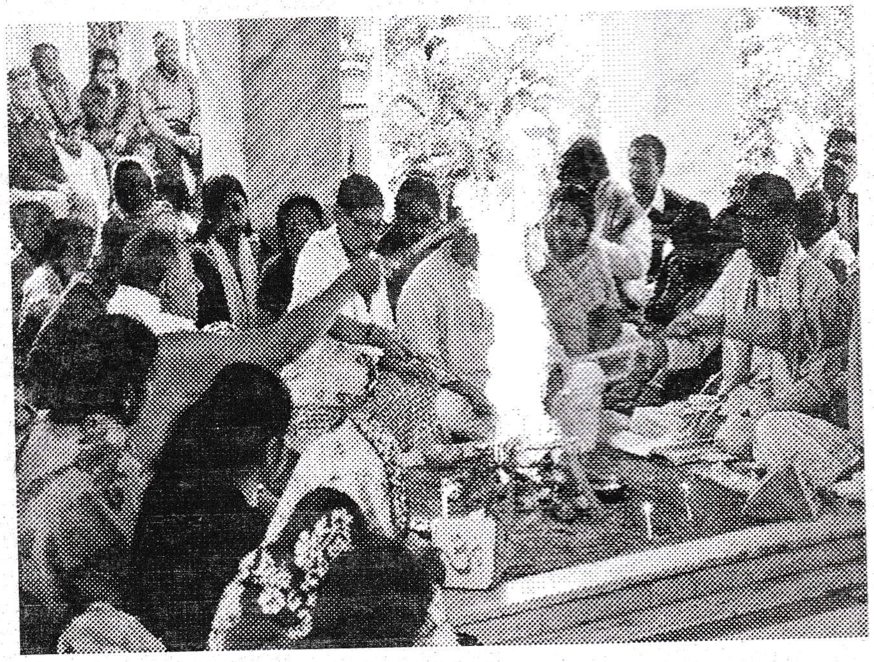

হুগলী আশ্রমের হোম

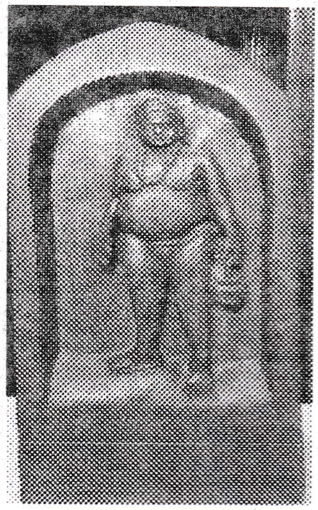

মুরারী মোহন দাসের হাতে তৈরী মূর্তি

উঠেছিল তার কোনদিন বিচ্ছেদ হয়নি। সেই সময় নিতাইবাবু P.W.D এর Construction Division এ চাকুরী করতেন। সেখানে প্রায়ই যেতাম। কিছু তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য। ওই অফিসেই নিতাইবাবুর মাধ্যমে সমীর সেনের সঙ্গে আলাপ হয়। আবার সমীর সেনের মাধ্যমে হেমন্ত চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

আমরা যেমন নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী তেমন হেমন্তবাবু ও সমীর বাবু ঈশ্বর বিশ্বাসী। এঁদের সঙ্গে আমার প্রায় আলোচনা হত। একটু আধটু তিক্ততার সৃষ্টি হত না যে তা নয়, তবুও এঁদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অটুট ছিল। হেমন্ত বাবুদের সঙ্গে মেশার ফলে ধর্ম সম্বন্ধে জানার ইচ্ছা আমার মধ্যে জেগেছিল। একদিন হেমন্তবাবু আর সমীরবাবু পরস্পর কথা বলছেন। প্রসঙ্গ এক সাধু। পাশে বসেছিলাম, জিজ্ঞেস করলাম ইনি কে? সমীরবাবু বললেন হেমন্তবাবুর গুরুদেব। প্রশ্ন করলাম এঁর দেখা পাওয়া যায় না? হেমন্তবাবু উত্তর দিলেন কেন দেখা পাওয়া যাবে না? বললাম আমি একবার দেখব। হেমন্তবাবুর বলার মধ্যে কোন আগ্রহ ছিল না। তবুও বললেন দেখাব। বললাম ঠিক করে বলুন কবে দেখাবেন? হেমন্তবাবু বললেন চলুন সামনের রবিবার। রবিবার সকাল ৭-৩০ মিনিটে শিয়ালদহ স্টেশনে আসুন। ৭-৪৫ মিনিটে সালার ট্রেন ধরে সোজা হুগলী আশ্রমে যাব। হেমন্তবাবুর বন্ধু গঙ্গায় ডুবে মারা যান বলে সেদিন আর যাওয়া হল না। আশাভঙ্গ বেশ ব্যথিত করল। আবার হেমন্তবাবুর সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন 'সামনের রবিবার যথাসময়ে যথাস্থানে দাঁড়াবেন। আমি ঠিক সময়ে আসব'। ইং ১৯৬৭ সালে ৩০শে এপ্রিল রবিবার ভোর থেকে প্রস্তুত হয়ে ঠিক সময়ে শিয়ালদহ মেন স্টেশনে হাজির হলাম। একটু পরে হেমন্তবাবু এসে হাজির। হাতে তাঁর বাজারের ব্যাগ। ট্রেনে ওঠার কিছু পরেই গাড়ি ছাড়ল। আমিও তাঁকে অনুসরণ করলাম। আন্দাজ ৯-১৫ মিনিটে হুগলীঘাট স্টেশনে গাড়ি থামল। আধমাইল হাঁটার পর জগুদাশ পাড়াতে গিয়ে হাজির হলাম। সামনেই আশ্রমের গেট। হেমন্তবাবু গেটের সামনে ভূমি স্পর্শ করে কপালে হাত দিয়ে নমস্কার করলেন। একটু এগুতেই দেখি আমাদের বাঁদিকে জামরুল গাছের নীচে চেয়ারে উপবিষ্ট এক সাধু। হেমন্তবাবুর এক হাত খালি আর এক হাতে ব্যাগ। তাঁর দুটো হাত একসঙ্গে করে কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। আমিও দেখাদেখি ঠিক ঐভাবেই সাধুজীকে প্রণাম করলাম। হেমন্তবাবু আর আমি আবার

হাঁটতে হাঁটতে এক মন্দিরের কাছে গেলাম। শুনলাম এনার নাম মুক্তিনাথ শিব। তিনি আমাকে দিয়ে শিব পুজো করালেন। পুজোর পরে তিনি আমার হাতে ফুলের মালা দিয়ে বললেন 'এটা আপনি আমার বাবার চরণে দেবেন'। হেমন্তবাবু ও তাঁর বাবার চরণে ফুলের মালা দিয়ে প্রণাম করলেন। আশ্রমে প্রবেশ করতেই আমার চেতনা যেন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। হেমন্তবাবুর দেখাদেখি আমিও সাধুজীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বলে ফেললাম বাবা, আমায় বিশ্বাস দিন। বললেন 'তোর বিশ্বাস হোক, তোর বিশ্বাস হোক, তোর বিশ্বাসই হোক'। প্রাণে যেন একরকম ভয় ভয় করছে। বসে থেকে ধ্যান করার চেষ্টা করছি। শ্রী শ্রী বাবা হঠাৎ বলে উঠলেন, শালা যোনীকীট, ধ্যান করছে। বাড়ীতে গেলে এক গ্লাস জল দেয় না। মনে পড়ে গেল একটা ঘটনা। কিছুদিন আগে একদিন সকালে স্নান সেরে আমাদের রান্নাঘরের ওপাশের দরজার ধারে কাপড় ছাড়ছি, কানে এল 'একটু জল খাব'। আমাদের বাড়ির একজন কেউ বলল হবে না। তাড়াতাড়ি সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম বলতে, যাবেন না, দেখি কেউ নেই, আমাদের বাড়ির সামনে অনেকটা ফাঁকা। কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় অত তাড়াতাড়ি অতখানি স্থান অতিক্রম করা। সেদিন বিস্মিত হয়েছিলাম। তাঁর কাছে বসে থাকার একটু পরে আমাদের জন্য প্রসাদ এল। প্রসাদ খাবার পর আশ্রমের মুক্তি পুকুরে গেলাম। আমরা দুজনে ডিস মেজে মুখহাত ধুয়ে আবার ঠাকুর বাবার কাছে এলাম। প্রণাম করেই সামনে বসলাম। সেদিন তাঁর কাছে বসে থাকি প্রায় ঘন্টা খানেক। তারপর তিনি নিজের ঘরে চলে গেলেন। বেলা দেড়টা কি দুটো হবে, ওখান থেকে চলে আসি। আমার ওপর তাঁর কতটা প্রভাব হল, প্রথমদিকে তা মোটেই বুঝতে পারিনি।

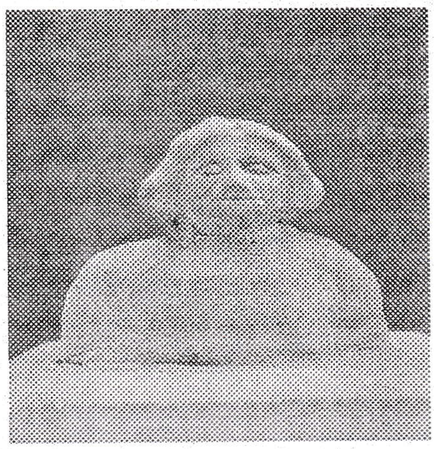

মুরারী মোহন দাসের হাতে তৈরী

অনেকদিন পর জানতে পারলাম শ্রী শ্রী ঠাকুরবাবা বালিগঞ্জে আছেন। নির্মলেশ্বর বাবু, মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর শিষ্য। তাঁর বাড়ীতেই তিনি উঠেছেন। হেমন্তবাবু ও সমীরবাবু দু'একবার ওখান থেকে ঘুরে এসেছেন। তখনও পর্যন্ত ঠাকুরবাবার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা আমার জাগেনি। হেমন্তবাবুর মুখে শুনি নির্মলেশ্বর বাবুর কথা। তিনি তাঁর গুরুদেবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'আপনি তো জার্মানীতে যাচ্ছেন, আমরা কি করে থাকব? তদুত্তরে মোহনানন্দ

ব্রহ্মচারী বলেছিলেন 'আমি বাইরে গেলে মাধবানন্দ মহারাজকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সেবা করবে। এতেই গুরুসেবার ফলতো পাবেই, তাছাড়া পাবে আনন্দ'। এসব কথা প্রায় শুনি আর আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যাই। ইদানিং দেখছি হেমন্তবাবুর গুরু মহারাজের বিষয় আলোচনা শুনতে খুব ভালো লাগছে। যখনই আমার বিষয় কর্মের ফাঁকে কিছু সময় পাই, তখনই হেমন্তবাবুদের অফিসে হাজির হই। উদ্দেশ্য গুরু মহারাজের বিষয় কিছু শোনা। সমীর বাবুর মুখে শুনলাম বড়মা নির্মেলেশ্বর বাবুর স্ত্রীকে বললেন, 'সত্যই ভাগ্য ভাল, তাই বাবাকে সেবা করার সৌভাগ্য পেয়েছিস'। তদুত্তরে নির্মেলেশ্বর বাবুর স্ত্রী বললেন 'আমি কি আর বাবার সেবা করব'। তখন ঠাকুর বাবা বললেন 'তুই ঠিক বলেছিস মা'।

ইং ১৯৬৮ সাল, সম্ভবত মার্চ মাসে খবর পেলাম শ্রী শ্রী ঠাকুর বাবা কোন্নগরে গঙ্গার ধারে ডাঃ সর্বাধিকারীর বাড়ীতে গেছেন। হেমন্ত বাবুকে বললাম চলুন না যাই। তিনি বললেন 'সামনের রবিবার সকাল ৮টা থেকে ৮.৩০ মিঃ পর্য্যন্ত শ্যামবাজার খাল পোলের ওপর অপেক্ষা করবেন। আমি নিশ্চিত যাব'।

রবিবার প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করলাম। হেমন্তবাবু এলেন না। বাধ্য হয়ে একাই ৩নং বাসে উঠলাম। Bata Stopege এ নেমে কিছু সন্দেশ কিনলাম। খুঁজে খুঁজে ডাঃ সর্বাধিকারীর বাড়ী গিয়ে হাজির। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম এখানে মৌনীবাবা আছেন? তিনি বললেন আপনি দেখা করতে চান তো ওপরে যান। ভয়ে ভয়ে ওপরে গিয়ে দেখি শ্রী শ্রী বাবা এক খানা চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর চরণের কাছে বাক্সটা রেখে প্রণাম করলাম। তিনি বললেন কি চাস? তাঁর স্পর্শে আমার এমন অবস্থা হল-আমি শুধু কাঁদতে লাগলাম। তাঁকে জবাব দিতে পারলাম না। তিনি বললেন 'বুড়ো বয়সে ব্রহ্মজ্ঞ হবে।' আবার তিনি বললেন 'একে কিছু খেতে দে'। একটা ডিসে কিছু প্রসাদ দেওয়া হল। প্রসাদ খাওয়া হলে পর আবার তাঁকে প্রণাম করে চলে এলাম। সেই সময়ে আমার কারোর সাথে পরিচয় হয়নি। সেখানে থাকার ইচ্ছা হয়েছিল কিন্তু সাহস হল না থাকার। জীবনে কোনদিন সাধুসঙ্গ করিনি। সেকানকার নিয়ম কানুন কিছুই জানা নেই। তাই বাধ্য হয়ে চলে এলাম।

ইং ১৯৭০ সালের কোন এক রবিবার। হুগলী আশ্রমে গেছি। শ্রী শ্রী বাবা যে

ঘরে থাকতেন সেই ঘরের মেঝেতে বর্তমানে যেখানে শ্রী শ্রী বাবার একখানা ছবি পাশের বালিশে ঠেস দেওয়া আছে আর সামনে শ্রী শ্রী বাবার পাদুকা। ঠিক ঐ জায়গাতে শ্রী শ্রী বাবা বসে আছেন। আর আমরা কয়েকজন তাঁর সামনে বসে আছি। শ্রী শ্রী বাবা হঠাৎ সেখানে শুয়ে পড়লেন। আর তাঁর পাদপদ্ম আমার বুকে রাখলেন। তখনই আমার হৃদয় কি এক আনন্দে ভরে উঠল। আর দুচোখ দিয়ে ঝরতে লাগল আনন্দাশ্রু। মনে হল আহা! কি ভাগ্য! কি ভাগ্য!

ইং ১৯৭০ সাল। কোন এক রবিবার ঠিক অমনি ভাবে বসে আছি। তখন ছিল সকালবেলা। শ্রী শ্রী বাবার কোন এক ভক্ত তাঁর ভোগের জন্য এক ডিস খাবার এনে হাজির। পাছে তাঁর ভোগে লোভ পড়ে সেই কারণেই অন্য দিকে চেয়ে আছি। হঠাৎ শ্রী শ্রী বাবা আমাকে ডেকে বললেন এই খাবি? বললাম দেন। তখনই তিনি তাঁর খাবারের অগ্রভাগ একখন্ড সিঙ্গাড়া আমায় দিয়ে দিলেন। আমিও খুব ভক্তি সহকারে দুহাত পেতে সেই সিঙ্গাড়া গ্রহণ করে বাইরে এলাম। কিছুক্ষণ পরে সেই সিঙ্গাড়া একটু ভেঙে মহাপ্রসাদ ভেবে গ্রহণ করলাম। বাকীটা একটা কাগজ মুড়ে রেখে দিলাম। বাড়ি ফিরে সেই সিঙ্গাড়াটা ভেঙে একটু একটু অংশ স্ত্রী, ছেলে ও মেয়েদের দিলাম। অনেকদিন পরে ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের জীবনী পাঠ করছিলাম। একস্থানে দেখি তিনি মা সারদাদেবীকে বলছেন—'যখনই দেখবে আমি আমার খাবারের অগ্রভাগ কাহাকে দেব তখনই জানবে আমার চলে যাবার সময় হয়ে এসেছে'। এইটুকু পড়ামাত্র পূর্বক্তো ঘটনাটা আমার স্মরণে এলো আর সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় ব্যথায় ভরে গেল। একদিন শ্রী শ্রী বাবার কাছে বসে আছি। তিনি বললেন-'কামার শালা দেখেছিস'? হাপরের আগুন দিয়ে লোহা গলায়। হাপরতো মরা চামড়া, তার ফুঁয়ে যদি লোহা গলে যায় - তাহলে এই জ্যান্ত চামড়ার ফুঁয়ে তোদের গলাতে পারব না? শ্রী শ্রী বাবা আরো বলতেন—"এ হাতে কাজ করো, ও হাতে ফল পাবে।"

ইং ১৯৭০ সাল। সকাল ৭.৪৫ মিনিটে সালার ট্রেন ধরি। আমাদের সঙ্গে ছিলেন হেমন্তবাবু, সুনীলবাবু আর বলাইবাবু। হেমন্তবাবু আমাদের জন্য ফুলের মালা কিনেছিলেন। প্রথমে বলাইবাবু শ্রী শ্রী বাবাকে প্রণাম করে বলেন- বাবা, আমায় দীক্ষা দিতে হবে। শ্রী শ্রী বাবা বলেন 'কিছুদিন তুই এখানে আয়। আমি তোকে দেখি আর তুই আমাকে দেখ। তারপর দেখা যাবে।' বলাইবাবুর প্রণাম শেষ হলে আমি শ্রী শ্রী বাবার শ্রী পাদপদ্মে ফুলের মালা দিয়ে প্রণাম করি আর প্রার্থনা জানাই- বাবা আমায় দীক্ষা দিতে হবে। শ্রী শ্রী বাবা বলেন 'হবে হবে'। বলাইবাবু সুনীলবাবুকে ঠাট্টা করতেন - যেহেতু সুনীলবাবু তাঁকে বাবা বলেন। সেই বলাইবাবু প্রথম বারেই তাঁকে বাবা বলে সম্বোধন করলেন। এটা ঠাকুরের লীলা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আজই ঠাকুর বাবা আমাদের আদেশ করেন '২৬শে জানুয়ারী সোমবার মুক্তিনাথ প্রতিষ্ঠা দিবস। ঐ দিন স্ত্রী, পুত্র ও অন্যান্য ভক্তদের নিয়ে

আশ্রমে আসবি।' শ্রী শ্রী বাবার আশ্রমে এলেই পেতাম যে এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি

হুগলী আশ্রমের হোম।

যা অপরকে বোঝানো যায় না। তিনি যাদের কৃপা করেন শুধু তারা অনুভব করতে পারে।

ইং ১৯৭০ সালের কোন এক রবিবার শ্রী শ্রী বাবা হুগলী আশ্রমে বসে আছেন। আমিও সেখানে বসে আছি। হঠাৎ শ্রী শ্রী বাবা বললেন 'সোনার হরিণ কখনো হয়? আমি থাকলে দমাদম দিতুম।' এমনি এক রবিবার শ্রী শ্রী বাবা বললেন 'সেতো শুধু গরু চরাত-আর আমায়?' শক্তিবাবু এই কথার ব্যাখ্যা করে বললেন 'ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ শুধুই গরু চরাতেন আর শ্রী শ্রী বাবাকে মানুষ চরাতে হচ্ছে।'.

ইং ১৯৭০ সালে ২৬শে জানুয়ারী সপরিবারে হুগলী আশ্রমে যাই। আমার স্ত্রী ছাড়া সবাই শ্রী শ্রী বাবার প্রথম দর্শন লাভ করে। অবশ্য আমার স্ত্রীর কথা আলাদা। সে শ্রী শ্রী বাবার দর্শন লাভ করে যখন তার বয়স ছিল ৬ বা ৭ বছর। আমার শ্বশুর মশাই তখন শিয়ালদহের তিনতলার কোয়ার্টারে থাকতেন। আর বিজয়বাবু থাকতেন একতলাতে। দোতলাতে রঞ্জনবাবুরা। এঁরা সবাই ছিলেন শ্রী শ্রী বাবার পরম ভক্ত।

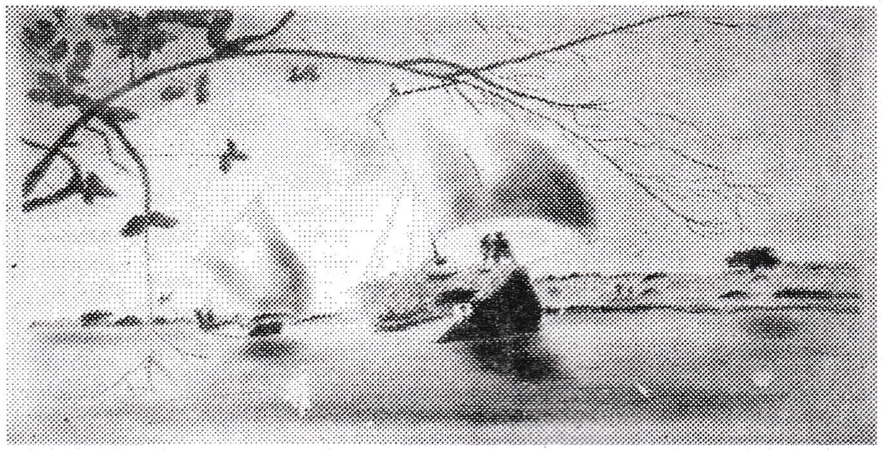

মুরারী মোহন দাসের হাতে আঁকা ছবি

ইং ১৯৩৪ বা ৩৫ সালে শ্রী শ্রী বাবা আসতেন বিজয়বাবুর কোয়ার্টারে। কোয়ার্টারের সামনে ফাঁকা মাঠে তেরপোল দিয়ে মন্ডপ করা হত। এখানেই বসত ব্রহ্মবাসর। সেইসময় আমার স্ত্রী তার মায়ের সঙ্গে শ্রী শ্রী বাবাকে প্রণাম করতে যেত। আমার শ্বাশুড়ী ঠাকুরানী ছিলেন শ্রী শ্রী বাবার পরম ভক্ত। আমার শ্বশুর মশাই ছিলেন এই রসে বঞ্চিত। একসময় শ্বশুর মশাইয়ের কোয়ার্টারে থাকতেন হৃষিকেশ মন্ডল। হৃষিকেশ বাবু কাঁচরাপাড়ায় বদলি হয়ে চলে যেতেই আমার শ্বশুর মশাই এই ঘরটি পান। বহু আগে থেকেই আমার শ্বশুর মশাইয়ের সঙ্গে হৃষিকেশ বাবুর পরিচয় ছিল। হৃষিকেশবাবু ছিলেন ঠাকুর বাবার পরম ভক্ত। শ্রী শ্রী বাবা যখন শিয়ালদহে আসতেন সেই সময়ে হৃষিকেশ বাবু আমার শ্বশুর মশাইয়ের বাসায় এসে উঠতেন। আজ সারাদিন আমরা সবাই হুগলী আশ্রমে ছিলাম। ব্রহ্মবাসরের পর প্রসাদ পেলাম। খুব দেরী হওয়াতে নৈহাটি লোকাল পাওয়া গেল না। ফলে আমাদের যেতে হল হুগলী স্টেশনে। এখান থেকে ট্রেন ধরে আসি হাওড়ায়। আবার ট্যাক্সি ধরে চলে যাই শিয়ালদহে ১০-৩৫ মিনিটে। আমাদের ফেরার ট্রেন ছিল ১০-৩০ মিনিটে। শ্রী শ্রী বাবার আশীর্বাদ নিয়ে ফিরেছি বলে বোধহয় আমরা যেই গাড়ীতে চাপলাম তখনই গাড়ী ছাড়ল।

শিবুদার মুখে ঠাকুর বাবার সম্বন্ধে দু-একটা কাহিনী শুনেছি। ১৯৭০ সাল নাগাদ তিনি কয়েকজন শিষ্যভক্ত পরিবৃত হয়ে দেওঘরে কয়েকদিন কাটিয়ে এসেছেন। একদিন সকালে শিষ্যদের মধ্যে বসে আছেন। তখন বাগানের মালী হন্তদন্ত হয়ে

বাবার কাছে হাজির হয়ে বলে বাবা, অন্যদিনের মত মহুয়া তলায় শিবলিঙ্গে ধূপ দিতে গিয়ে দেখি একটা বিষধর সাপ শিবলিঙ্গকে জড়িয়ে আছে। ঠাকুর বাবা বললেন 'তুই আবার যা। ভাল করে দেখে এসে খবর দে।' একটু পরে সে আবার এসে বলে এবারে গিয়ে দেখি এক সাধু বসে আছেন। বললেন বাবা কি আমায় একবার দেখা দেবেন না? বাবা যখন হাঁটেন তখন দু'জন লোক দু'পাশ ধরে থাকে। তখন কিন্তু তিনি নিজেই সোজা হয়ে ঐ খোয়ার রাস্তা দিয়ে গটগট করে হাঁটতে লাগলেন। আর শিষ্যরা তাঁর পিছু পিছু এগুতে লাগল। সেখানে এসে বাবা কি একটা মন্ত্র পাঠ করলেন। তারপর বললেন 'যা উদ্ধার হয়ে যা'।

মুরারী মোহন দাসের হাতে তৈরী মূর্তি

আর একদিন ঠাকুর বাবা তাঁর শিষ্যদের নিয়ে দেওঘরের ত্রিকূট পাহাড়ের পাদদেশে গেলেন। বাবা, শিবুদা প্রভৃতি যাঁরা অথর্ব তাঁরা নিচেই রইলেন আর সবাই পাহাড়ের ওপর গেল। শ্রী শ্রী বাবা তখন ঐ গুহার কাহিনী বলতে লাগলেন। ওখানে বারোজন সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। বালানন্দ ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে কিছু বলেন। ইতিমধ্যে একজন সাধু মহাপুরুষ এসে শ্রী শ্রী বাবাকে প্রণাম করেন এবং বলেন বাবা, ঐ বারোজনের মধ্যে আপনিও তো একজন। আর সত্য করে বলেন বহুবছর পরে আপনি এখানে আসছেন কিনা? বাবা বললেন—'এই বেটা তুই ওখানে চুপ করে বোস্।'

১৯৭০ সালের দু-একটা ঘটনা—

তখন হেমন্তবাবু B.E. College Construction Division এ কাজ করতেন। ঠিকাদারীর ফাঁকে ফাঁকে হেমন্তবাবুর কাছে যেতে হত। অর্থাৎ আমি বাধ্য ছিলাম সেখানে যেতে। কোন এক অজ্ঞাত শক্তি আমায় সেখানে টেনে নিয়ে যেত প্রায়ই। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু থাকত শ্রী শ্রী বাবার প্রসঙ্গে। তাঁর সম্বন্ধে কথা কইতে কী যে আনন্দ পেতাম তা অপরকে বোঝানো যাবে না। একদিন হেমন্তবাবুর অফিসে গিয়েছি। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু আমাদের দুজনের স্ত্রী প্রসঙ্গে। হেমন্তবাবু বললেন 'আমার স্ত্রী আমাকে যেরূপ ভালোবাসে আর এই ভালবাসাটা যদি ঈশ্বরের দিকে দিত তাহলে ঈশ্বর লাভ হয়ে যেত।' আমিও বললাম আমার স্ত্রীর

ঐ একই অবস্থা। আমরা প্রায় প্রতি রবিবার হুগলী আশ্রমে যেতাম। রবিবার আশ্রমে গিয়েছি। শ্রী শ্রী বাবার কাছে বসে আছি আমি আর হেমন্তবাবু। হঠাৎ শ্রী শ্রী বাবা বলে উঠলেন 'অফিসে আর কোন কথা নেই - আমার স্ত্রী আমায় কত ভালবাসে'। আমরা দুজনে মাথা নিচু করে বসে রইলাম। আর একদিন হেমন্তবাবুর অফিসে গিয়েছি, হেমন্তবাবু বললেন 'বাবার কাছে গেলে শুধু বেদান্তের কথা, বুঝি যে ছাই'। আমিও সায় দিয়ে বললাম- এইবার উপনিষদ ভাল করে পড়তে হবে। আবার এক রবিবার আমরা শ্রী শ্রী বাবার আশ্রমে হুগলী গিয়েছি আর বাবার কাছে বসে আছি। হঠাৎ শ্রী শ্রী বাবা বলে উঠলেন 'এরা সব বেদান্ত শিখবে। এ গুরুমুখী বিদ্যা। থাক্ শালারা এখানে পড়ে।' আমি আর হেমন্তবাবু মুখ চাওয়াচায়ি করছি।

সপরিবারে ঁ মুরারী মোহন দাস

এমনি এক রবিবার শ্রী শ্রী বাবার কাছে বসে আছি। আমাকে লক্ষ্য করে শ্রী শ্রী বাবা বললেন সব পুজো করে। ঠাকুর ঘরে ন্যাংটা ছবি রেখেছে। তখন মনে মনে ভাবতে থাকি আমাদের ঠাকুরঘরে ন্যাংটা ছবি আছে কি? অনেক রাতে বাড়ী ফিরেছি। তবুও ছেলে মেয়েরা অপেক্ষা করে বসে আছে। শ্রী শ্রী বাবার সঙ্গে কি কথা হলো তা শুনবে বলে। তাদের বললাম ঠাকুরবাবা আমায় বললেন ঠাকুরঘরে ন্যাংটা ছবি রেখেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমার মেজো মেয়ে মিলি বলে উঠল হ্যাঁ বাবা আছে। ঠাকুর ঘরে গিয়ে দেখা গেল একটা পেরেকে ক্যালেন্ডার ছিল। তার ওপর আমার সার্ট রাখা হয়। দেখলাম সত্যই ছবিটা তাই। সঙ্গে সঙ্গে ক্যালেন্ডারটা খুলে ফেলে দিলাম।

১৯৭০ সালে শ্রী শ্রী বাবা একবার চন্দননগরে লক্ষ্মীবাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলেন। আমি হেমন্তবাবু, রবিবাবু (সরকার) বলাইবাবু ইত্যাদি মিলে সেই দিন লক্ষ্মীবাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। যখন আমি সেখানে যাই তখন আমার পেটে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল। লক্ষ্মীবাবুর বাড়ীর সিঙ্গাড়া, আলুরদম ইত্যাদি যেই খেলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার পেটের ব্যথার উপশম হয়ে গেল।

বিকালের দিকে শ্রী শ্রী বাবার ব্রহ্মবাসর বসেছে এক ছাতের প্যান্ডেলে।

শক্তিবাবু কি বলছেন, ভাল শুনতে পাচ্ছিনা - কারণ লক্ষ্মীবাবুর ঠিক পাশের বাড়ীতে মাইক চলছে। শক্তিবাবু বললেন "আমরা বলেছিলাম কিছুক্ষণের জন্য মাইক বন্ধ করতে কিন্তু বিয়ে বাড়ী মাইক বন্ধ করতে রাজী নয়। উত্তরে আরো বলেছে 'আপনাদের গুরুদেব আবার আসতে পারেন কিন্তু বিয়ে তো আর দ্বিতীয় বার হবে না।' প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে ব্রহ্মবাসর চলল। যখন ব্রহ্মবাসর শেষ হয়ে গেল শক্তিবাবু বললেন - 'এতক্ষণ কি আপনারা মাইকের শব্দ শুনেছেন?' এই আসরে অন্তত দুইশত লোক যোগ দিয়েছিল, কেউই মাইকের শব্দ শুনতে পায়নি কিন্তু শক্তিবাবুর কথা শেষ হতে না হতেই মাইকের প্রচণ্ড শব্দ ভেসে আসতে লাগল।

শক্তিবাবু আরো বলতে লাগলেন একি ওঁর মাহাত্ম দেখছ? ঐ সামনে ডাক্তার বসে আছেন। ওঁর বাড়ী এই চন্দননগরে এবং বাবার শিষ্য। একবার এই ডাক্তার বর্ষাকালে যখন চারিদিক ভেসে গেছে,- যখন নিজেই ড্রাইভ করছিলেন হঠাৎ ভুল বশতঃ গাড়ীটা পুকুরের ভেতর ঢোকে কিন্তু কি করে গাড়ীটা পুকুর থেকে উঠে এলো তা ডাক্তার সাহেব জানেন না।

ডাক্তার সাহেব ঘাড় নেড়ে শক্তিবাবুর কথার সমর্থন করলেন। আর পাশেই শ্রী শ্রী বাবা পাথরের মতন নিশ্চল হয়ে বসে আছেন যেন তিনি কিছুই জানেন না।

তারপর প্রসাদ পাওয়ার পালা। আমার একদিকে হেমন্তবাবু আর অন্যদিকে ছিলেন রবিবাবু (সরকার)। পোলোয়া পরিবেশন করা হলে পর আমি বললাম 'রবি দা কি করা যায় বলত'? রবিবাবু বলে 'দাদা! কিছু ভেবো না, মানুষ একবারের বেশী দুবার মরে না। তুমি নিশ্চিন্ত মনে খেয়ে যাও'। আমি নিশ্চিন্ত মনে প্রসাদ খেলাম। সে রাত্রিতে আমার পেটের যন্ত্রণা হল না। কিন্তু পরের দিন যেই বাড়ীতে ঝোল ভাত খেলাম, চার ঘন্টা পরে নিত্যকার সঙ্গী যন্ত্রণা এসে হাজির হল।

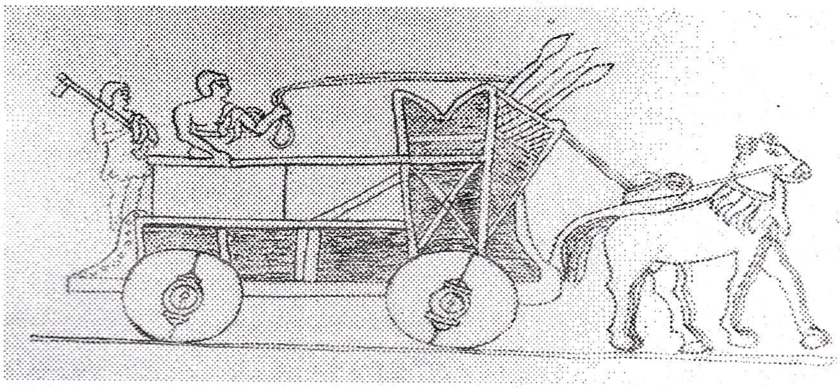

মুরারী মোহন দাসের হাতে আঁকা ছবি

১৯৭০ সালের কোন একদিন হুগলী আশ্রমেতেই এক গুরুভাইয়ের ছেলের উপনয়ন উপলক্ষ্যে প্রচুর পরিমানে পোলোয়া রূপ প্রসাদ খেয়েছিলাম। বাড়ীতে ফেরার আগে যেই শ্রী শ্রী বাবকে প্রণাম করলাম, তিনি আমাকে আর হেমন্তবাবুকে আদেশ করে বললেন— 'তোরা একটু বসে যা'। আমরা প্রায় দশ মিনিট বসে ছিলাম। শ্রী শ্রী বাবা ঘরের ভেতর চলে গেলেন আর আমরাও বাড়ী ফিরলাম। তারপর আর কোনদিন আমার পেটের যন্ত্রণা হয়নি। ডিয়োডিনাল আলসার চিরতরে আমার কাছ থেকে বিদায় নিল।

শ্রী শ্রী বাবার ব্রহ্মবাসরে আমার চেতনা কোথায় গিয়ে হাজির হত তা আমিই জানতাম না। ফলে পরের দিন আমার গুরুভাইদের মধ্যে গতদিনের ব্রহ্মবাসর সম্বন্ধে আলোচনায় আমাদের মধ্যে মতানৈক্য হত। একবার কোন্নগর আশ্রমে ব্রহ্মবাসরে বসে আছি - হঠাৎ শুনতে পেলাম "এই দেখ"। শ্রী শ্রী বাবার দিকে চাইতে দেখতে পেলাম - শ্রী শ্রী বাবার মাথার ওপরে দিব্য রথের একদিকে বসে আছেন ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ আর একদিকে আছেন অর্জুন। চোখের চশমা খুলে, তারপর মুছে চশমা পরে দেখলাম - সেই একই দৃশ্য। অন্ততঃ পাঁচ মিনিট ধরে এদৃশ্য দেখেছিলাম।

আমরা ভক্তই হই আর শিষ্যই হই যে ভক্তিভরে শ্রী শ্রী বাবাকে একবার প্রণাম করেছে - সে কিছু না কিছু পেয়েছে। বিফল মনোরথ হয়ে ফিরেছে কেউ আমার জানা নেই।

১৯৭০ সাল হবে। তখন আমাদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল। কারণ আমার ঠিকাদারী ব্যবসা ভাল চলছিল না। একদিন আমার বড় ছেলে বাবলুর একখানা Interview এর চিঠি এল। হেমন্ত বাবুর সঙ্গে ঠিক হল আমি আর বাবলু শ্রী শ্রী বাবর কাছে হুগলী আশ্রমে যাব। পরের দিন সকালে Salar ট্রেন ধরে আমি, বাবলু ও ছোট মেয়ে রং ঠাকুর বাবার কাছে হাজির হলাম। প্রণামান্তে বাবলু তার Interviewর চিঠি শ্রী শ্রী বাবার হাতে দেয়। শ্রী শ্রী বাবা চিঠিটা নিয়ে একটু ছিঁড়ে দিয়ে বললেন 'তোর চাকরি হয়েই আছে'। তারপর শ্রী শ্রী বাবা স্নান করতে গেলেন। এই ঘটনার ঠিক দিন সাতেক পরে ছেলের appointment letter এসে হাজির। সঙ্গে সঙ্গে ১০-৫০ এর ট্রেন ধরে বাবলু অফিসে Join করল।

১৯৭১ সালে রাখীপূর্ণিমার দিন নাগেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হয়। প্রাণপন চেষ্টা করেও কোন্নগর আশ্রমে যেতে পারিনি। সেদিন ছিল ধর্মঘট। সোনারপুর স্টেশন থেকে বাড়ী ফিরে আসতে হয়। সন্ধ্যের পুজোর সময় ঠাকুর বাবার কাছে কাঁদি আর মাথা খুঁড়ি। পরের রবিবার আশ্রমে গিয়ে শ্রী শ্রী বাবার চরণে প্রণাম করি। একটুপরেই আমাকে বললেন 'যারা ব্রহ্মজ্ঞ হবে তারা কি অত সহজে বিচলিত হবে? শ্রী শ্রী বাবা একদিন বললেন- 'যে সব মাছ জেলে থেকে দূরে দূরে থাকে

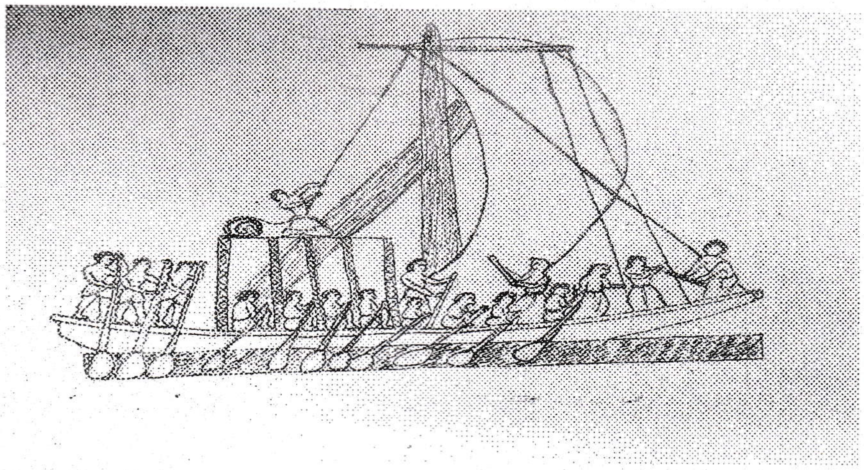

মুরারী মোহন দাসের হাতে আঁকা ছবি

তারাই জেলের জালে ধরা পড়ে। আর যারা জেলের পায়ের কাছে থাকে তারা কোনদিনই জেলের জালে ধরা পড়ে না। তেমনি তোরা শ্রী ভগবানের পায়ের কাছে থাকিস তাহলে আর মায়ার ফাঁদে পড়তে হবে না। বাবা আরো বলতেন 'খাটের একটা পায়া টানলে সব পায়া চলে আসবে। শুধু একটা পায়া আসে না'।

ইং ১৯৭৩ সাল, ১৩ই জুন ফুলু আর মিলিকে নিয়ে আমি হুগলী আশ্রমে যাই। প্রথমে আমরা মুক্তিনাথের পুজো করি, তারপর শ্রী শ্রী বাবাকে প্রণাম করে তাঁর চরণ পাশে বসি। পাশে ছিলেন মুকুলবাবু (জজসাহেব)। তিনি ফুলুকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কতদূর পড়েছ? ফুলু বলল বি. এ. পাশ করে একটা স্কুলে সাময়িক কাজ করছি। ওখানে স্থায়ী কিছু হবার সম্ভবনা নেই। মুকুলবাবু বললেন তুমি বাবাকে বলতে পার নি? কথাটা শ্রী শ্রী বাবার কানে যেতেই তিনি বললেন 'কারোর সাধ্যি নেই তোকে চাকরী ছাড়ায়। আর বললেন 'তুই একদিন আসিস'। আমরা ঠিক করলাম ফুলু ইছাপুরে গেলে যাকে হোক সঙ্গে নিয়ে আবার কাল আশ্রমে আসতে পারবে আর আমিও মিলি সোজা বাড়ী চলে আসব। সন্ধ্যের দিকে আমরা হুগলী আশ্রম থেকে বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। পথে ইছাপুর স্টেশনে ফুলুকে নামিয়ে দিলাম।

১৯৭৩ সাল ১৫ই জুন মঙ্গলবার ফুলু, নসেজদি আর আমার ভাগ্না পার্থ ইছাপুর থেকে হুগলী আশ্রমে যায়। সেদিনের ঘটনা ফুলুর কাছ থেকে জানতে পারি। মঙ্গলবার সারাদিন শ্রী শ্রী বাবা ফুলুকে খুব বকলেন। প্রণাম করতে গেলে বললেন 'হিঁয়াসে নিকাল যাও, ছোবড়া, ভোমরা'। আবারও যখন তাঁর কাছে গেল

তখন তিনি বললেন 'তুই এখনো যাসনি, তোকে এত বকলাম'। আরো বললেন 'কাছে আয়'। ফুলুর মাথায় তিনবার জয়গুরু করলেন। আবার তিনি খোঁজ নিলেন- 'বারুইপুরের মহিলাদের'। সবাই শ্রী শ্রী বাবার সামনে রাস্তার ওপর প্রসাদ পেল।

হুগলী আশ্রমের হোমের আহূতি।

বাড়ী ফিরে আসার সময় ফুলু যখন শ্রী শ্রী বাবাকে প্রণাম করতে গেল তখন খুব নরম সুরে বললেন - 'দেবালয়ে এলে কিছু আনতে হয়'। ফুলু বললে হ্যাঁ বাবা আমি সন্দেশ এনেছি। শ্রী শ্রী বাবা বললেন 'আগে বলিসনি কেন, তাহলে বকতাম না'। ফুলু বললে আপনার বকা আমার আশীর্বাদ। ফুলুর এই কথা শুনে শ্রী শ্রী বাবার দুচোখে অশ্রু ঝরে পড়ল।

১৯৭৩ সালে কোন এক রবিবার চাতকের উদাহরণ দিয়ে বললেন "বৃষ্টির ধারা যখন নামে চাতক আকাশে পী পী করে উড়ে বেড়ায়। তার মুখে এক ফোঁটাও

জল পড়ে না। এতে বৃষ্টি ধারার কোন দোষ নেই - তেমনি সাধু-মহাত্মারা যে বাণী উপদেশ দেন সে সব বাণী না মেনে চললে সাধু মহাত্মাদের কি দোষ? তাঁরা তো জীবের মঙ্গলের জন্য বলছেন। সাধু বাক্য মেনে চল। বেদের কথা মেনে চল, এতে কল্যাণই হবে। সংসারের তাপে মানুষ জ্বলে যায়। ব্রহ্মঋষির ছায়ায় প্রাণ সুশীতল হয়। কে জানে মানুষ্য জন্ম আর হবে কিনা? এতো রাজবিদ্যা। গুরু যা উপদেশ দেন তা পরিশ্রম করে উপাসনা করতে হয়, ফলের আশা না রেখে"। আরো বললেন ছড়া কেটে, 'গুরু দিলেন লকড়ি হৃদয়ে পকর লিয়ো পকরী'। শ্রী শ্রী ঠাকুরবাবা প্রণববাবুকে একবার বলেছিলেন 'প্রণব বাজারে ভালো সাবান পাওয়া যায় না? পরে বললেন এই সামনের মানুষগুলোকে পরিষ্কার করে ধুয়ে মুছে দিই আবার কালিঝুলি মেখে নোংরা ঘেটে এখানে বসে আছে'।

শ্রী শ্রী ঠাকুরবাবা কিন্তু দীক্ষা বলতেন না। তিনি বলতেন 'নাড়ী কাটা হবে'। সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন ধাইমা মায়ের সঙ্গে যোগসূত্র কেটে দিয়ে মায়ার পৃথিবীর সঙ্গে বেঁধে দেয়। তেমনি শ্রী শ্রী ঠাকুরবাবা মায়ার পৃথিবীর সঙ্গে যোগসূত্র 'নাড়ী' কেটে পরমাত্মার সঙ্গে যোগসূত্র বেঁধে দেন। এই কারণেই ঠাকুরবাবা বলতেন 'নাড়ী কাটা হবে'। শ্রী শ্রী বাবা শিবরাত্রির দিন মুক্তিনাথের সামনে বসে অঞ্জলি ভরে ফুল, বেলপাতা নিজের মাথায় রেখে মন্ত্র বলছেন 'শিবোহং-অহং ব্রহ্মাস্মি' আবার বেদান্তের সভায় নিজের বুকে হাত রেখে বলেছেন-"দেখে নে দেখে নে, কেন মিছে কাশী যাবি বিশ্বনাথকে দেখতে, এখানেই দেখে নে। পরক্ষণেই বলতেন - বাকী সে আঁখ কাঁহা"।

মুরারী মোহন দাসের হাতে তৈরী মূর্তি

একদিন আমি, আমার ভাগনা নেপাল, বড় মেয়ে ফুলু, মেজ মেয়ে মিলি ও বড়ছেলে বাবলু হুগলী আশ্রমে গেলাম। বিকেল বেলায় বেদান্ত পাঠের সময় হঠাৎ মেঘ করে এল। সকলে ভাবছে এবার বুঝি বৃষ্টি হবে। শ্রী শ্রী ঠাকুর বাবা বললেন বাড়ী

যাবার চিন্তা করছিস! আকাশের দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে মেঘ কেটে গেল। আকাশ ও পরিষ্কার হয়ে গেল।

একদিন এক গুরুভাই শ্রী শ্রী বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন এই বলে 'বিজয়দার একমাত্র পুত্র অল্পবয়সে মারা যায় তবুও তিনি সদানন্দময় - যেন তাঁর কোন বেদনা নেই। অথচ রাজা দশরথ পুত্র শোকে দেহত্যাগ করেন, এর কারণ কি? শ্রী শ্রী বাবা বললেন 'রাজা দশরথের তো আর গুরু কৃপা ছিলনা'।

শ্রী শ্রী বাবা বলতেন 'গুরুর উপদেশ দৃঢ়রূপে ধর ভবসিন্ধু গোষ্পদ হবে চিন্তা নাহি কর'।

মুরারী মোহন দাসের হাতে আঁকা ছবি

শ্রী শ্রী ঠাকুর বাবা প্রায় বলতেন "তোদের জন্য গোক্ষুর করে দিলাম। তোদের আর ভয় কিরে? তোরা তো গুরু পেয়েই গেছিস"। শ্রী শ্রী বাবা বলতেন "ভগবানকে দেখব কিরে? সাক্ষ্যাৎ বসে আছি"। নিজের বুক চাপড়ে বলেছেন 'শিব এব সাক্ষাৎ স্বয়ং'। আমার প্রতিটি রোমকূপে ব্রহ্ম বসে আছেন"। তিনি বলতেন "তোরা কি করে ঈশ্বর পাবি রে, তোদের সে ব্রহ্মচর্য কোথায়"? তারপর নিজের চরণ দেখিয়ে বলতেন "তোরা আর কি করবি, তবে মনটা এইখানে ফেলে রাখিস্, তাতেই হবে"। আবার বলেছেন "তোরা চাইলেই আমি তোদের ব্রহ্ম পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি"।

তিনি বলতেন "গুরু আসেন জন্ম ও জন্মান্তরে। তিনি শিষ্যের সমস্ত ভার নেন এবং যতদিন না শিষ্যের মুক্তি হয়, ততদিন তিনি সর্বদা শিষ্যকে দেখেন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। শিষ্যকেও গুরুর কথাই সর্বদা চিন্তা করতে হয়, তাতেই মনের পবিত্রতা আনেও মলিনতা দূর হয়। গুরু যে মন্ত্র কানে দেন তাই সর্বদা জপ করতে করতে মন শুদ্ধি হয়"।

১৯৭৪ সালের ১৩ই জানুয়ারী শ্রী শ্রী ঠাকুরবাবার লক্ষ্ণৌ যাবার আগে আমরা আশ্রমে যাই। সেদিন শ্রী শ্রী বাবা খুব অসুস্থ ছিলেন। আমাকে আর আমার স্ত্রীকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেবে না কয়েকজন আশ্রমবাসী। বললাম শ্রী শ্রী বাবাকে কোন বিরক্ত করব না। শুধুমাত্র প্রণাম করে চলে আসব। আমরা তাঁর ঘরে গিয়ে প্রণাম করলাম। তখন শ্রী শ্রী বাবা বললেন 'আজ আশ্রমে কোন মহিলা নেই যে আমাকে সেবা করবে। আমার স্ত্রীকে বললেন তুই আজ রাতে আমার কাছে থাকতে

পারবি'? সে বলল হ্যাঁ বাবা পারব। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তোর কি মত? বললাম হ্যাঁ বাবা, আমার কোন অসুবিধা হবে না। তারপর আমি নিচে চলে এলাম। শ্রী শ্রী বাবা আমার স্ত্রীকে বললেন "তোর মুখটা খুব শুকনো। নিচে যা - নিচে গিয়ে আমার নাম করে ভান্ডারীর কাছ থেকে খাবার চেয়ে খেয়ে আয়"। সে নিচে এসে ভান্ডারীর কাছ থেকে খাবার চেয়ে নিয়ে খায়। আমার স্ত্রী ওপরে গেলে তিনি বললেন 'আমার কাছে শো'। শ্রী শ্রী বাবা বিছানায় শুয়ে ছিলেন। আমার স্ত্রী ভাবল আমি বাবার কাছে শোবো? তাই বিছানায় না শুয়ে মাটিতে বসে শ্রী শ্রী বাবার পদসেবা করতে লাগল। আমার স্ত্রীকে মাটিতে বসে থাকতে দেখে শ্রী শ্রী বাবা বললেন 'তুই আমার কাছে শুলিনা? আমাকে একটু জল খাওয়া'। সে তৎক্ষণাৎ জল এনে, শ্রী শ্রী বাবা শুয়ে ছিলেন, একটু একটু করে তাঁকে জল খাইয়ে দেয়। তারপর শ্রী শ্রী বাবার পাশে অতি সন্তর্পনে শুয়ে পড়ে। শ্রী শ্রী বাবা আমার স্ত্রীকে বলেন তোর খুব কষ্ট না? আমার স্ত্রী বললে হ্যাঁ বাবা। সে শ্রী শ্রী বাবার পাশে শুয়ে শুয়ে ভাবছে কাল সকালে বাবলুর ভাত রাঁধবে কে? শ্রী শ্রী বাবা ধড়মড়িয়ে উঠে বললেন 'তুই বাড়ী যা-কাল সকালে কে ভাত রাঁধবে'? সেই রাতে আমার স্ত্রী আর থাকেনি। সেদিন বিকেলে আমরা বাড়ী ফিরি।

১৯৮২ সালের শনিবার দেওঘরে বালানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে গিয়েছিলাম। তখন বেলা ১০.৩০ মিঃ। আশ্রমে বিভবানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সারা দেওঘরে তিনি ভূতনাথ বাবা নামে পরিচিত। ভূতনাথ ব্রহ্মচারী শ্রী শ্রী ঠাকুর বাবা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন। তিনি প্রথমে বলেন উজ্জয়িনী স্টেশন থেকে মোটরে গেলে এক ঘন্টা পর ভর্তৃহরির গুহায় ঠাকুরবাবা অনেকদিন তপস্যা করেছিলেন। তিনি আরো বলেন বালানন্দ মহারাজের সঙ্গে শ্রী শ্রী বাবা ও তিনবার নর্মদা পরিক্রমা করেছিলেন। প্রতিবার পরিক্রমা করতে তিনবছর সময় লাগত। সেই সময় পরিক্রমার বা জমায়েতের নায়ক ছিলেন গৌরী শঙ্কর মহারাজ। তিনি আরো বললেন তৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে শ্রী শ্রী বাবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। একথাও বলেন 'শ্রী শ্রী ঠাকুর বাবার মত উচ্চস্তরের সাধু সচরাচর দেখা যায় না'। শ্রী শ্রী বাবা ওঁকারেশ্বরে মার্কণ্ডেয় আশ্রমে অনেকদিন বাস করেছিলেন। এই স্থান থেকে কিছুটা দূরে একটা বিশাল বটগাছ আছে। তার নিচে একটা ছোট মন্দির আছে। শ্রী শ্রী ঠাকুর বাবা এখানে অনেকদিন বাস করেছিলেন।

ভূতনাথ ব্রহ্মচারী ঠাকুর বাবাকে বলেন " ঈশ্বর আছেন তার কোন প্রমান নেই। ঈশ্বর বলে ডাকলে কোন সাড়া পাওয়া যায় না। কিন্তু বহুলোকের মধ্যে ও যদি কোন লোককে তার নাম ধরে ডাকা হয় সে সাড়া দেয়"। উনি আরো বললেন 'এই যে কাপড়, এর মূল তুলো, সমবায়ে এর উৎপত্তি। কিন্তু ঈশ্বর। ঠাকুর বাবা ভূতনাথ ব্রহ্মচারীকে একটা রসগোল্লা দিয়ে খেতে বলেন। ওনার রসগোল্লা খাওয়া হলে,

ঠাকুর বাবা তাঁকে প্রশ্ন করলেন 'রসগোল্লার কিরূপ স্বাদ লিখে দেখাও'? আবার

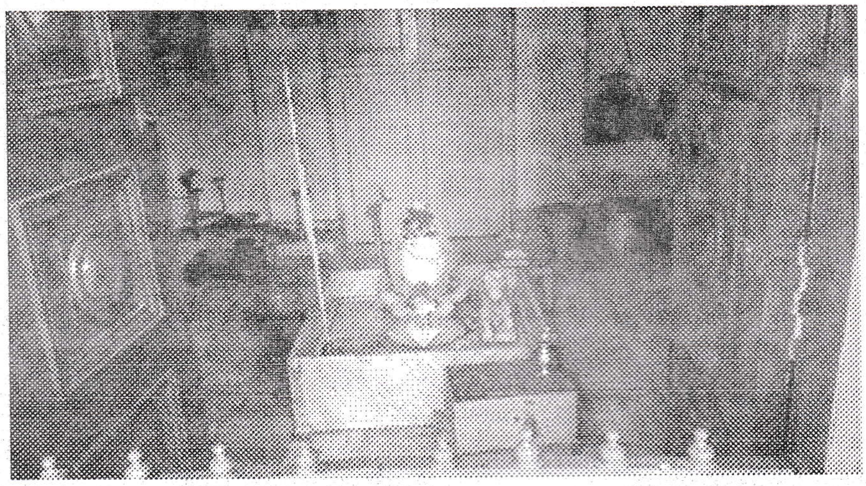

কোন্নগর আশ্রমে, নাগেশ্বর মন্দির

ঠাকুর বাবা বললেন 'যদি তোমার কোন জায়গায় পুড়ে যায় এবং তখন যে যন্ত্রনা হয় তা তুমি দেখাতে পারবে না। কারণ এটা অনুভব্য। অনুভবের কিছু কাউকে দেখানো যায় না'। তেমনি ব্রহ্ম অনুভব্য'। শ্রী শ্রী বাবা আরো বললেন 'ব্রহ্মবিদ, তিনি নিজে ব্রহ্ম হয়ে যান। এই ব্রহ্মবিদই গুরু। সাক্ষাৎ ঈশ্বর। এঁদের কৃপায় জীব শিব হয়ে যায়'।

আবার মঙ্গলবার বালানন্দ আশ্রমে আমরা গেলাম। যাওয়া মাত্র ভূতনাথ ব্রহ্মচারীর সাক্ষাৎ পেলাম। তিনি শ্রী শ্রী বাবার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এই দেওঘরে। সেটা ছিল ইং ১৯৫২ সাল। পরে আবার ১৯৫৬ সালে সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। ভূতনাথ ব্রহ্মচারী বললেন 'কখন তিনি কি বেশে থাকেন তা তিনিই জানতেন। হয়তো তিনি ছেঁড়া কাপড় পরে দেহাতি লোকের বেশে ঘুরে বেড়াতেন'। শ্রী শ্রী বাবার ব্যবহৃত দণ্ড আমাকে দেওয়ার আগে ভূতনাথ ব্রহ্মচারী বলেছিলেন "যাঁর দন্ড তাঁকে আগে জিজ্ঞেস করি। তাঁর সম্মতি পেলেই তখন দেব"।

১৫/৯/৮২ বুধবার। আজ আমার বড়ই শুভদিন। শ্রী শ্রী বাবার ব্যবহৃত দণ্ড আজই আমার হাতে আসে। তিনি আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেন 'জানিনা এই দণ্ড কতদিন শ্রী শ্রী বাবার কাছে ঘুরেছে? কাকে আঘাত করতে গিয়ে দণ্ড ভেঙে যায়'। শ্রী শ্রী বাবা বলেছিলেন 'এই দণ্ড আর যেতে চাইছে না, থাক তোর কাছে'। সেইদিন

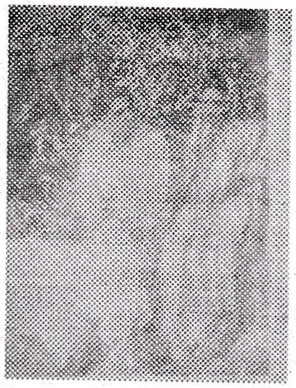

থেকে দণ্ডটা ভূতনাথ ব্রহ্মচারীর জিম্মায়। তিনি বললেন 'আমি কোথায় যাই, কোথায় থাকি ঠিক নেই। বরং শ্রী শ্রী বাবার কোন ভক্ত গৃহস্থ শিষ্যের বাড়ী গেলে এই দণ্ডের যত্ন হবে। আর এই দণ্ড গৃহস্থের প্রচুর কল্যাণ করবে'। ভূতনাথ ব্রহ্মচারী আমার শ্রী শ্রী বাবা যে গান গেয়েছিলেন সেই গানটি গেয়ে শোনালেন এবং লিখে নেবার সুযোগ দিলেন। গানটি এই —

ওঁ হরি ওঁ ওঁ তৎ সৎ

তুমি হে গুরুবে, পরমপুরুষ, ত্রিগুণে ব্যাপ্ত আছ ত্রিজগত।
সন্ধ্যা পূজা বন্দনা সকলই তোমার উপাসনা।
হে মোহন বিশ্ব, কি সুন্দর দৃশ্য, তুমি তো প্রভু করেছ রচনা।
বিন্ধ্য নীলগিরি, সুমেরু ধবল, মন্দার গিরিরাজ, তুমি হিমাচল।
উর্দ্ধ গগনে, তারকা তপনে, চন্দ্র কিরণে, তুমি আছ জ্যোতির্বৎ।
ওঁ হরি ওঁ ওঁ তৎ সৎ।

শ্রী শ্রী বাবার দেওয়া বা লেখা বেদান্ত বিচারের একখানা পুরানো খাতা ওনার কাছে আছে। খাতাখানা চাইতে তিনি বললেন ঠাকুর বাবা নিষেধ করে গেছেন — যাকে তাকে (অনধিকারীকে) এই বিদ্যা দিতে। তিনি দূর থেকে খাতার ভেতরের অংশ একবার আমাদের দেখালেন। তারপর খাতাটা মুড়ে আমাদের সকলের মাথায় একবার স্পর্শ করে দিলেন। ভুতনাথ ব্রহ্মচারী বললেন — শ্রী শ্রী বাবা বলতেন কালাপুরী (মালপো) ধলিডাল (পায়েস), ঘোটংঘটা (হালুয়া)। এইসব খাদ্যগুলি ঠাকুর বাবার খুব প্রিয় ছিল।

ঁমুরারী মোহন দাসের
২২ বছর বয়সের ছবি

"সুন্দরকে যদি দেখতে চাও তবে হৃদয়কে সুন্দর কর।"

শ্রীশ্রী মাধবানন্দ গিরি মহারাজ।

"সংসার সমুদ্র পার হতে গুরুর শ্রীচরণই একমাত্র ভরসা।"

শ্রীশ্রী মাধবানন্দ গিরি মহারাজ।

"দুর্লভ মনুষ্য জনম অবহেলায় হারাইও না।"

শ্রীশ্রী মাধবানন্দ গিরি মহারাজ।

"ভগবানের চরণপ্রাপ্তির দুটি উপায়"— দান ও ধ্যান।

"ছাড়িস যদি দাগাবাজী, কৃষ্ণ পেলে ও পেতে পারিস।"

শ্রীশ্রী মাধবানন্দ গিরি মহারাজ।

" 'প্রকৃত আর্ত্তীকে' ভগবান নিজেই গুরুরূপে উদ্ধার করেন।"

শ্রীশ্রী মাধবানন্দ গিরি মহারাজ।

"টাই টোপর পড়ে রবে, কর্ম নিয়ে বিচার হবে।"

শ্রীশ্রী মাধবানন্দ গিরি মহারাজ।

দ্বিতীয় পর্ব

"পিতৃদেব" — রেবা দাস

জন্মিলে কোন্ এক অজ পাড়াগাঁয়ে
বিংশ শতকের দুই দশকে।
বীর্যহীন শত শত পুরুষের মাঝে,
তুমি এলে সিংহরূপে বীরবিক্রমে।
এত শক্তি কোথায় পেলে?
বেদনাও হার মেনেছে-তোমার কাছে।
তুমি চলেছিলে আপন গতির ছন্দে,
কত রক্তচক্ষুকে অবহেলে।
এসেছিলে ধরাধামে বিপ্লবীরূপে
জীর্ণ পুরাতনে ধ্বংস করে,
নব ধ্যান ধারণার জন্ম দিয়ে,
পরিবেশকে গড়লে নব কলেবরে,
ধরার সম্পদ পারে নাই বাঁধিতে,
চলেছিলে, আপন দুর্বার গতিতে
অফুরন্ত প্রাণশক্তি তোমার আধারে
কত মনিমানিক্য ছড়ায়েছ মোদের তরে।
ঝঞ্ঝামুখর দিনরাত্রি কাটায়ে
তবু অবিচল ছিলে গুরুপদে।
বসুধার মানদন্ড চলে কাঞ্চনমূল্যে,
তাই জগৎ বোঝেনি তোমারে।
এমনই অন্ধ অজ্ঞ আমি
তোমার মহান কর্ম বুঝিনি।

"অন্তর দেবতা" — রেবা দাস

একটু শান্তি, একটু আনন্দের তরে
ছুটেছি কত দেশ দেশান্তরে।
কত নদী, কত সাগর, কত পাহাড়
ডিঙ্গিয়ে পেরিয়ে গেছি কত বনান্তর।
অনুসন্ধান করেছি কত সাধক সাধিকার দ্বারে,
হয়ত কিছু শান্তি, কিছু আনন্দ হস্তগত হয়েছে।
অখন্ড আনন্দ হয়নি আমার করতলগত,
বারবার ঘুরেছি, ভেবেছি এখানে নয়,
অন্যখানে, তাই ছুটেছি এক থেকে বহুদূরে।
শেষে নিজ ঘরখানিতে এসে
শ্রী গুরুর প্রতিকৃতির পাদপদ্মের তলে বসে
পেলাম কি তৃপ্তি, কি আনন্দ হৃদয়ে,
আমরা শুধু ছুটে চলি দেশ দেশান্তরে
যদি একান্তভাবে নিজ গৃহকোণে বসে,
ডাকি নিজ নিজ অন্তর দেবতারে
তবেই সেই আনন্দের স্বাদ লভিব অন্তরে।

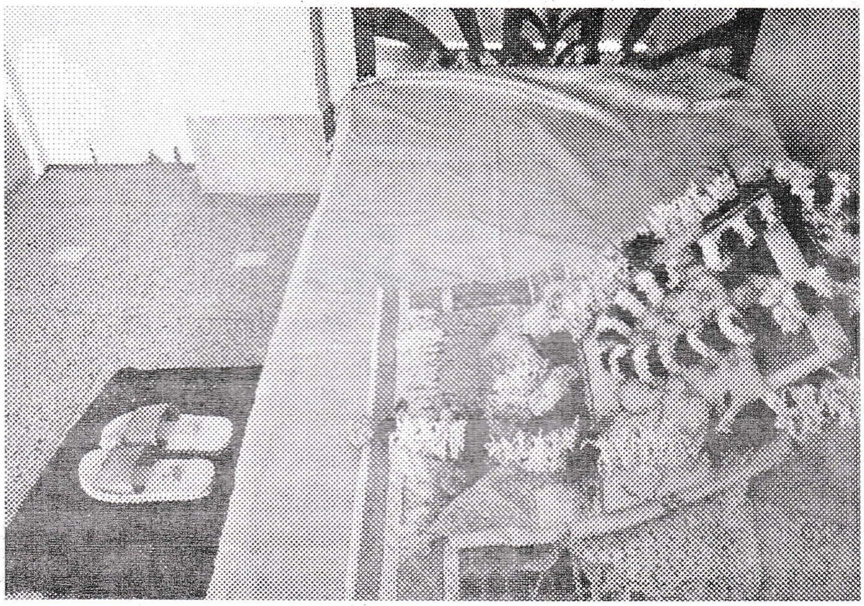

ঠাকুর বাবার ব্যবহৃত কক্ষ

কোন্নগর আশ্রমে, ঠাকুর বাবার মর্মর মূর্তি।

আমি এক সাধারণ নারী। আমার ক্ষুদ্র জীবন পরিসরে কিছু অভিজ্ঞতা লিখতে বসেছি। জানিনা তা কতটা সুপাঠ্য হয়ে উঠবে। তবুও লিখতে বসলাম, আমি স্বর্গীয় মুরারী মোহন দাসের মধ্যমা কন্যা। আমার পিতার অসীম, অদ্ভুত স্নেহ ও সাহচর্য্যে বড় হয়ে উঠেছিলাম। আমার ছেলেবেলার সময় কেটেছে বাবার সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের মধ্যে। তাই ছোটবেলা থেকেই আমার মনের অগোচরে একটু একটু করে আধ্যাত্মিক ভাবনার উন্মোচন ঘটেছিল। জীবনের কোন এক পরিসরে এসে আমি পেয়েছিলাম তারানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের আশ্রয়। পাশাপাশি কালজয়ী মহাপুরুষ মৌনীবাবার সাহচর্য্যও পেয়েছিলাম। বাবার হাত ধরে এই দুই মহাপুরুষের কৃপা লাভ করেছি। এমন কিছু ঘটনা আছে সেগুলি সত্যই অলৌকিক। যার কোন ব্যাখ্যা হয় না। এরকম বহু ঘটনার সাক্ষী আমরা। তারি মাঝে কিছু কিছু ঘটনা মনে রেখাপাত করে। জীবনের কোন এক চরম মুহূর্তে এসে মনে হয়েছিল জীবনটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া বড়ই দুরূহ। এতটাই ছিল শারীরিক যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণার হাত থেকে উপশম পেয়েছিলাম ঠাকুরবাবার আশীর্বাদে। আজ অনেক বছর কেটে গেছে। কখনো এই কথা বলার সুযোগ হয়নি। আজকে সেই সুযোগ পেয়ে আমি আমার ছোট্ট লেখনীতে প্রকাশ করলাম। আমার ক্ষমতা খুবই সীমিত। আমার লেখায় যদি কোন ত্রুটি থেকে থাকে দয়া করে মার্জনা করবেন।

বিনীতা
মিলি কুণ্ডু

আমি শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় শ্রী মুরারী মোহন দাসের ছোট মেয়ে লিপিকা। দশ বারো বছর বয়স থেকে শ্রী শ্রী ঠাকুর বাবাকে দেখেছি। বহুবার হুগলী ও কোন্নগর আশ্রমে গিয়েছি। তাঁর উপদেশও শুনেছি। কিন্তু তখন তেমন ভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা ছিলনা। ক্রমশ বড় হয়ে বুঝলাম কি দুর্লভ মহামানবকে পেয়েছি। ১৯৭০ সালে বাবা, মার দীক্ষা হয়েছিল হুগলী আশ্রমে। আমিও গিয়েছিলাম। সারারাত ধরে নামকীর্তন ও হোমযজ্ঞ হয়েছিল। আমি সেই আনন্দের সাক্ষী ছিলাম। ১৯৭১ সালে রাস পূর্ণিমার দিন দিদির দীক্ষা হয়। ঠাকুর বাবার কৃপা ছিল বলেই বাবা, মা ও দিদির দীক্ষার সময়ও উপস্থিত ছিলাম। এবারেও তাই, সারারাত ধরে অনুষ্ঠান হয়েছিল। কিছু না বুঝলেও ভাল লেগেছিল। আমি যদিও শ্রী শ্রী ঠাকুরবাবার দীক্ষিত সন্তান নই। তবুও ঠাকুর বাবার কৃপা আমার ওপর বর্ষিত হয়েছে। ওনার কাছে প্রার্থনা জানালে আমার চলার পথ সুগম হয়। ওনার ওপর আমরা খুবই নির্ভর করি। মনে করি মাথার ওপর শ্রী শ্রী ঠাকুর বাবার আশীর্বাদ আছে। আমার আবার ভয় কি? শুধু আমি কেন, আমার মেয়েদের ও মনে হয়।

আমি একজন সাধারণ নারী হয়েও বলছি ওনাকে ডাকলে উনি বুঝিয়ে দেন যে উনি আমাদের পাশে আছেন। কৃপাও মেলে। ওনার কথা বলতে গেলে অন্ধের হস্তি দর্শনের মতো হয়। যাঁরা শ্রী শ্রী ঠাকুর বাবার সঙ্গ করেছেন তাঁরা নিশ্চয় জানেন ঠাকুর বাবার মহিমা। আমি আর কি বলব। তবে শ্রী শ্রী ঠাকুর বাবাকে যে পেয়েছি, - তা আমার বাবা মুরারী মোহন দাসের অবদান। ছোটবেলা থেকে তিনি আধ্যাত্মিক পথে নিয়ে গিয়েছিলেন।

গীতার ভাষায় বলি — 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।'

বাংলা অর্থ — (যিনি যে প্রকারে আমার উপাসনা করেন, আমি তাঁহাকে সে ফল প্রদান দ্বারাই অনুগৃহীত করি)।

বিনীতা
লিপিকা দত্ত

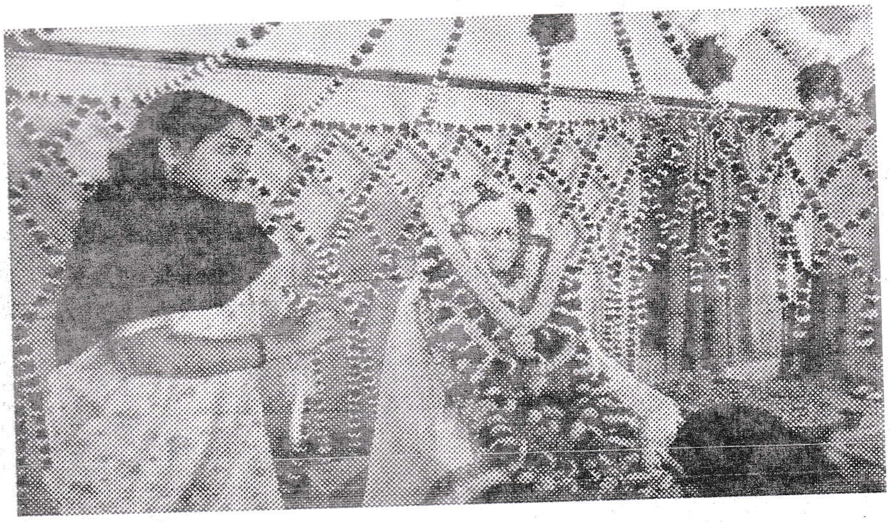

হুগলী আশ্রমের ঠাকুরবাবার মর্মর মূর্তি।

আমি এক অতি সাধারণ। আমার লেখার বিশেষ ক্ষমতা নেই। তবুও আমি লিখতে বসেছি আমার জীবনের কিছু ঘটনা আর ফেলে আসা কিছু মুহূর্ত। জানিনা সেই মুহূর্তগুলি ঠিক করে তুলে ধরতে পারব কিনা। আমার ছোটবেলার বেশ কিছুটা সময় কেটেছে দাদু, দিদা, বড়মাসি ও মামাদের সাথে। অবসর পেলেই এক ছুটে পৌঁছে যেতাম মামার বাড়ির অমোঘ টানে। সেখানের ছোট ছোট বহু ঘটনা আজও আমার মনের মনিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। দাদু ,দিদার ভালোবাসা আর স্নেহের ঝুলির এক অদ্ভুত টান অনুভব করতাম। গ্রীষ্মের ছুটি ও পুজোর ছুটির নির্জন দুপুরে শোনা নানা গল্প যেন আজও কানে ভাসে। দাদু পুরানো যুগের মানুষ হয়েও নতুন চিন্তা ভাবনা করতে পারতেন। যার মধ্যে আমি এক অনন্য মাত্রা খুঁজে পেতাম। তাই কবির ভাষায় বলি —

‘ ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা’।

দাদুর হাত ধরেই গল্পের বই পড়তে শিখেছি। সাদা ক্যানভাসকে রঙিন করতে শিখেছি। আরো কত কিছু। মাঝে মাঝে দাদু তাঁর নাতি নাতনিদের নিয়ে বসে পড়তেন রং তুলি নিয়ে। আবার কখনো বা চলত সাহিত্য আলোচনা। ও একটা কথা বলা হয়নি। আমি হলাম দাদুর ছোট নাতনি গার্গী। দাদুর ছবি আঁকার ক্ষমতা, বিভিন্ন বিষয়ে অপার জ্ঞান, শিল্প নৈপুণ্য আমাকে অবাক করে দিত। মাঝে মাঝে দাদু আমাদের উপহার দিতেন বই, ছবির খাতা, আর রং পেনসিল। আর দিতেন বিভিন্ন পূজা সংখ্যা। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র,

বিভূতিভূষণ, সেকস্‌পিয়ারের বই পড়ার সুযোগ ঘটেছে দাদুর সংগৃহীত বইয়ের সম্ভার থেকে। মাঝে মাঝে ঘরোয়া অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের নাটক, গান ও কবিতার চর্চা হত। এর পাশাপাশি চলত আধ্যাত্মিক চর্চা। আমার বড় হয়ে ওঠা এক আধ্যাত্মিক পরিবেশের মধ্যে। ছোটবেলা থেকে মা, মাসি, দাদু ও দিদার হাত ধরে আশ্রমে যাওয়ার শুরু। তাই ধর্মের বীজ কখন যে মনের অগোচরে জায়গা করে নিয়েছিল তা বুঝতে পারিনি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি চলত আধ্যাত্মিক আলোচনা। সেই আলোচনায় নামকীর্তনের সাথে পাঠ হত শ্রী শ্রী ঠাকুর বাবার কিছু বাণী। আলোচনার কর্ণধার ছিলেন আমার দাদু ও এক মামিমা। যদিও আম ার সৌভাগ্য হয়নি ঠাকুরবাবা বা মহারাজকে চাক্ষুষ দেখার। কিন্তু আমি মনে করি তাঁদের কৃপা আমার ওপর সর্বদা বর্ষিত হচ্ছে। জীবনে যখনই কোন না কোন সমস্যায় পড়েছি, উদ্ধার ও হয়েছি তাঁদের কৃপায়। আজ হয়ত দাদু আমাদের মধ্যে নেই সেটা ভাবতে গেলে ভাল লাগেনা। কিন্তু আমাদের জীবন চিরস্থায়ী নয় সেটাই চিরসত্য। কবির ভাষায়

— 'যেতে নাহি দিব! হায়,
তবুও যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়'।

দাদু আমাদের যা দিয়ে গেছেন তাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদেরই। আর বেশী লিখব না। তবে লেখা শেষ করার আগে আমার জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরের একটা ঘটনা লিখব। জীবনের কোন এক সময়ে আমি পেশাগত কিছু সমস্যায় পড়েছিলাম। সেই সময় বেশ চিন্তার মধ্যে আমার দিন কাটছিল। এমনি সময়ে একরাতে শ্রী শ্রী ঠাকুরবাবা আমার স্বপ্নে উপস্থিত হন। তার কিছুদিনের মধ্যেই অলৌকিকভাবে আমার সেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আমি বিশ্বাস করি ঠাকুরবাবার কৃপায় অনেক কিছু অসম্ভব সম্ভব হতে পারে। তাই এই বলে শেষ করি —' সীমার মাঝে, অসীম তুমি, বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর'।

চেনা অচেনা

ঝর্ণা বিশ্বাস

(সহঃ প্রধান শিক্ষিকা, অবসরপ্রাপ্তা)

মানুষটিকে চিনি অথচ ভাল করে চিনি না বা জানি না, এমন একজনের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ সেদিন কেমন করে যেন হয়ে গেল। আমাদের সহ শিক্ষিকা রেবা দাসের খুব বই পড়ার নেশা। রেবা প্রায়ই নানা ধরনের বই কেনে এবং অবসর সময়ে বা টিফিনের সময়ে বসে পড়ে। ওর ভাইও বইমেলা থেকে ওর জন্য বই কিনে আনেন। তবে এই বইগুলি বেশীরভাগই ভক্তিমূলক। আমরা কোন বই পড়তে চাইলে আমাদের ও প্রায়ই বই দিয়ে থাকে। হাতে পেলে দেখা যায় বইগুলিতে এত সুন্দর করে মলাট দেওয়া ও যার বই তার নাম লেখা যে দেখে মুগ্ধ হতে হয়। জিজ্ঞাসা করাতে রেবা বলল ওর বাবা নাকি প্রত্যেক বইয়ে এভাবে মলাট করে নাম লিখে দেন। একদিন ওর বাবার তৈরী কাঠের উপর খোদাই করা রবীন্দ্রনাথের একটি মূর্তি দেখে অবাক হলাম। মূর্তিতে ছিল শিল্পীর হাতের সূক্ষ্ম কাজকর্ম। মাঝে মাঝে উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন শুনি। তার মধ্যেও এসব করেন। ওনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ করতে ইচ্ছা হোল। আগে ওনাকে অর্থাৎ শ্রী মুরারী মোহন দাস মশাইকে পথে বা বাড়ীতে কয়েকবার দেখেছি বটে; কিন্তু ভাল করে কথা বলা হয়নি কোনদিন। একদিন স্কুল ছুটির পর রেবার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম ওদের বাড়ীর দিকে। সঙ্গে ছিলেন মিনতি দি। আগেই শুনেছি শ্রী দাস মশাই মদারাটের বর্ধিষ্ণু দাস পরিবারের মধ্যে বেশ গণ্যমান্য ব্যক্তি। বয়স তখন আশির ওপরে।

ঘরে ঢুকে দেখি সৌম্য শান্ত দীর্ঘকায় মানুষটি খাটের ওপর টান টান হয়ে বসে আছেন। পরণে গাঢ় গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী, মোটা কাল ফ্রেমের চশমার নীচে একজোড়া সুদূর প্রসারী চোখ। চারিদিকে রাখা আছে ধর্ম পুস্তক ও অন্যান্য বই। দেওয়ালে টাঙানো আছে গুরুদেব ও গুরুজনদের সাদা কাল ছবি। আমরা 'মেসোমশাই, কেমন আছেন?' বলে প্রণাম করতে উনিও প্রতি নমস্কার জানালেন। শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি এখনও ভালই আছে। এ কথা সে কথার পর বললাম তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কিছু কথা আমরা জানতে আগ্রহী। এতে তাঁর কোন বিরক্তির ভাব দেখলাম না। বরং টুকরো টুকরো স্মৃতি চারণের মাধ্যমে তিনি নিজেকে নিয়ে গেলেন সুদূর অতীতে। যদিও বলার সময় বার বারই গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে যেতে লাগল এবং চোখ জলে ভরে গেল। বিশেষ করে গুরুদেব সম্বন্ধে বলতে গেলে যেন আরও বেশী কান্না ও কাঁপুনি দেখা যেতে লাগল। আমরা ওনাকে থামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। তবুও বলতে যখন হবে তখন একে একে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। এতে একদিকে যেমন আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ হোল অন্যদিকে উনি

নিজেকে হয়ত কিছুটা ভারমুক্ত করলেন।

ছোটবেলা থেকেই মেসোমশাইয়ের ছবি আঁকায় মন এবং দেখলাম সেটা এখনও আছে। ভাল আবৃত্তি করতে পারতেন। তবে এসব ব্যাপারে বাড়ির কারও কোন উৎসাহ ছিল না। গতানুগতিকভাবে পড়াশোনা নিয়েই দিন কেটে গেছে। ছাত্রজীবনে ঘোরতর নাস্তিক্যবাদী ছিলেন। পূজার্চনা ধর্মে কর্মে মন ছিলনা। এমন কি ঠাকুরের প্রসাদ চরণামৃত ইত্যাদি ছুড়ে ফেলে দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। তবে মন প্রাণ পড়ে থাকত সমাজে অবহেলিত নীচুশ্রেণীর মানুষের প্রতি। মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ ভাব তার মনে ব্যথার সঞ্চার করত। এই সময় তিনি শ্রী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'র‍্যাডিক্যাল পার্টি'তে যোগদান করেন। এই দলের অপর সদস্য এবং সুবক্তা বারুইপুরের পদ্মপুকুর নিবাসী শ্রী সীতাংশু চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং আজও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। সাংসারিক ক্ষেত্রে দেখা যায় স্ত্রী পুত্র কন্যাদের নিয়ে ঘর সংসার করলেও ঠাকুর দেবতার প্রতি অবিশ্বাস থাকায় প্রথম জীবনে বাড়ীতে অনেক অশান্তিও হয়েছে। যাইহোক এইভাবেই দিনের খেয়া বেয়ে চলছিলেন উনি আপন গতিতে। কিন্তু দীর্ঘ জীবন পথের মাঝামাঝি এল এক অবিস্মরণীয় পরিবর্তন। খেয়া নৌকা বাঁক নিল যেন অন্য পথে, অন্য কোন খানে। ১৯৬৭ সাল শ্রী দাস মশাইয়ের জীবনের এক সন্ধিক্ষণ বলা যায়। ৪৫ বৎসর বয়সে উনি নাস্তিক্যবাদের গোঁড়ামি ছেড়ে আস্তিক্যবাদে পদার্পণ করলেন। এর পিছনের কারণ বোধহয় তাঁর পরম আরাধ্য গুরুদেব শ্রদ্ধেয় শ্রী মাধবানন্দ গিরি মহারাজের সান্নিধ্যলাভ। এঁর কাছেই পরে উনি দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং দীক্ষান্তে তাঁর অস্থির মন কিছুটা শান্ত হয়। যে মানুষের ঠাকুর ঘরে বা মন্দিরে মন ছিল না এখন তাঁর সেখানেই অবিরাম যাতায়াত। গীতা উপনিষদের আলোচনায় মেতে উঠলেন। এবার সংসারের কাজে আর মন নেই। ব্যবসা দেখাশোনার কাজে অবহেলা দেখা দিল। শেষে ব্যবসা বজায় রাখাই দায় হয়ে পড়ে। ছেলেমেয়েদের তখনও পড়াশোনা শেষ হয়নি। পরিবারটি কিছুদিন আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়ল এবং সেই নিয়েই এক অশান্তির বাতাবরণ তৈরী হয়। ঠিক এমন সময় প্রখর সূর্যের আলোর মত করুণাঘন গুরু মাধবানন্দের উজ্জ্বল উপস্থিতি তাঁর মনের অন্ধকার ও সেই সঙ্গে সংসারের অন্ধকারও দূর করতে লাগল। কোন্নগর ও হুগলীতে এই গুরুদেবের আশ্রম। প্রায় প্রতি রবিবার মেসোমশাই সেখানে যাতায়াত করতে লাগলেন। আমাদের বন্ধু রেবাও বাবার সঙ্গে সেখানে যেত এবং এখনও মাঝে মাঝে যায়। অন্যান্য ছেলেমেয়েরা এবং তাঁদের মা কিন্তু সর্বদাই গৃহকর্তার ধর্মপথের সহায়ক ছিলেন। এরপর ছেলেদের ও রেবার চাকুরীতে যোগদান এবং তাদের ছোট দুই মেয়ের একে একে বিবাহ সম্পন্ন হোল। এসব কিছুর মূলে আছে গুরুদেবের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আশীর্বাদ। মেসোমশাই নিজে এবং বাড়ীর সবাই তাই বিশ্বাস করেন।

কাজের শেষ নেই। ৭৬ বছর বয়সে পা দিয়েও উনি একটা নতুন কিছু যেমন কাঠের কাজ আরম্ভ করলেন। গুরুদেবের মূর্ত্তি, রামকৃষ্ণের মূর্তি ইত্যাদি কাঠ দিয়ে তৈরী করতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথের কাঠের মূর্তিতো আগেই দেখেছিলাম। এরপর ১৯৯০ সালে ঘটল এক মর্মান্তিক ঘটনা। এক পথ দুর্ঘটনায় ওনার স্ত্রীর অকালমৃত্যু মানুষটিকে গভীরভাবে শোকাহত করেছিল। ধীরে ধীরে উপাস্য দেবতা ও গুরুদেবের আশীর্বাণীকে আশ্রয় করে মনকে আবার স্থিতাবস্থায় আনতে পেরেছেন। বই পড়ার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। তার সঙ্গে জপ তপ পূজা আহ্নিক তো আছেই। শরীরে ব্যাধির প্রকোপ দিন দিন বাড়তে থাকলেও মানুষটি এখনও ভোর ৪টায় ঘুম থেকে ওঠেন। নিয়মিত ধর্মচর্চা গীতাপাঠ ইত্যাদি যেমন করেন তেমনি নাতি-নাতনীদের গল্পও করেন আবার প্রয়োজনে পুত্র-পুত্রবধূ বা মেয়েদের প্রয়োজনে নানা পরামর্শ দিয়ে থাকেন। আমাদের সঙ্গে কথা বলে সেদিন উনি বেশী খুশী হয়েছেন বলে মনে হোল। ছোট বউ রীনা আমাদের কত কিছু খাওয়ালো। শুক্তো, ডালের বড়া থেকে শুরু করে চা মিষ্টি সবই খেলাম।

এমনি করে মুরারী মোহনের দিন যায়, দিন আসে। সততা ধর্মে বিশ্বাস গুরুদেবের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে এখনও যেন তিনি মৃত্যুকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। এমন এক সুস্থ দীর্ঘ জীবন আমাদের কাম্য। তবে গাছের পাতা তো একদিন খসবেই যতদিন ধরে রাখা যায় আর কি। সে দিনের সেই পড়ন্ত বেলার মৃদু আলোয় দেখা মেসোমশাই-এর বার্দ্ধক্যের সেই দীপ্ত সৌন্দর্য যেন আরও কিছুকাল আমাদের চোখকে মোহিত করে এবং আমাদের স্মৃতিপটে চির জাগরুক থাকে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- এই লেখাটি ২০০০ সালে 'কোরক' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। তখন স্বর্গীয় মুরারী মোহন দাস জীবিত ছিলেন।

ভোরের আলো

চৈতালী মারিক

কোলকাতা থেকে মাত্র ২৫ কিলোমিটার দূরত্ব এই লিচু - পেয়ারার উদ্যাননগরী বারুইপুরের, তারই এক অখ্যাত গ্রাম মদারাট। একসময় শিক্ষা আর সংস্কৃতি মাথা খুঁড়ে মরতো, কিন্তু কুসংস্কার আবৃত এই পানবরজের গ্রামে ঢোকার সুযোগ পেতো না। দুই একটা শাল - সেগুন অথবা অর্জুন গাছ একলা খোলা আকাশের দিকে মাথা তুলতো, আর সব বেতের মতো স্রোতের টানে মাথা নুইয়ে দিত।

কালাপাহাড়ের মতো নাস্তিক্যবাদের মশাল হাতে -ঐ গন্ডগ্রাম থেকে উঠে আসেন শ্রীযুক্ত মুরারী মোহন দাস, যাকে আমি দাদু বলেই জানি। রক্তের সম্পর্ক ঠিক কতখানি তা নিয়ে বৃথা তর্কে যেতে চাইনা। তবে তাঁর ঋজুতা, সাহসিকতা ও বলিষ্টতাকে আমি স্যালুট করি। M.N.Roy -এর মন্ত্রশিষ্য বলে যারা নিজেদের জাহির করেন, তাঁরাও হয়তো জানেন না একলব্যের মতো দাদুর নিভৃত সাধনার কথা। র‍্যাডিক্যাল সমাজপার্টির এক সাধারণ সদস্য হয়েও রাজনৈতিক আদর্শের চেয়েও জ্ঞানচর্চায় বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁকে আমি যেটুকু দেখেছি, জানি না হয়তো অন্ধের হস্তি দর্শনের মতো, তাঁকে ঘিরে থাকতো বই আর বই। সেই পুঁথির জ্ঞানকে হৃদয়ের জারকরসে জারিত করে কথাচ্ছলে গল্প বলতেন তার দিদিভাই অর্থাৎ আমাকে।

একসময় পুঁথি পড়ুয়ার জ্ঞানতপস্যা মিশে গেল ভক্তির অমৃতসাগরে। কথায় কথায় নিজের অতীতের দিকে হাত দেখিয়ে বলতেন—"আমি ছিলাম ঘোর নাস্তিক, তখন আমি জানতাম না অমৃতের স্বাদ, ঠাকুরবাবা আমায় অমৃতের স্বাদ দিলেন,"

আমি বলতাম তাহলে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। "আজি এ প্রভাতে রবিরকর / কেমনে পশিল প্রাণের পর / কেমনে পশিল গুহার আঁধারে-প্রভাত পাখির গান / না জানি কেনরে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিছে প্রাণ...দাদুর চোখে তখন আনন্দাশ্রু টলমলিয়ে উঠত, আবেগে অধীর হয়ে বলতেন" ঠাকুরবাবা যে স্পর্শমনি, মদারাটের এই নুড়ি পাথরের অকর্মা ঢেলাটাও যে তার ছোঁয়ায় সোনা হয়ে গেল, দিদিভাই।" রাধা ভাবে ভাবিত শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নাকি সর্বদা অশ্রুজলে ভাসতেন বৈষ্ণব পদাবলীর কবিরা অন্তত তাই বলেন। মহাপ্রভুকে দর্শনের সৌভাগ্য আমি অর্জন করিনি কিন্তু ভগবৎ প্রেমিকের চোখে অশ্রু ঝরতে দেখেছি, আমার শৈশব আমার কৈশোর দাদুর হাত ধরে নাম সংকীর্তনের অমৃতসাগরে অবগাহন করেছে। কান্না ছোঁয়াচে কিনা আমি জানিনা, শুধু এটুকু জানি ভগবানের নামগানে চোখের জলে ভাসা পরম সুখের।

আজও দৈববানীর মতো কানের মধ্যে ধ্বনিত হয় তাঁর জলদ গম্ভীর কন্ঠ 'বিশ্বাস! বিশ্বাস! বিশ্বাস!' এ এক দুর্লভ বোধ, এক আত্ম আবিস্কারের সপথ, এক অনির্বাণ আলোক, যা আমি লাভ করেছি আমার দাদুর কাছ থেকে। আপনাদের কাছে যাঁর পরিচয় — শ্রীযুক্ত মুরারী মোহন দাস নামে।

ভোরের সুর

চৈতালী মারিক

আমার শৈশব তোমাকে ধরে দোল খায়
মাঠে, ঘাটে, আগানে বাগানে,
তুমি স্বপ্ন ফেরি কর, মাটির বুকে মূর্তি সাজিয়ে
গড়ে দাও পার্ক, ছোট্ট জমানো জল হয়ে ওঠে সুইমিং পুল।
আমার শিউলি কুড়োনো মন প্রাণভরে সাঁতার কাটে তাতে।
ইচ্ছে ডানা মেলে আমি উড়ি তোমার সাথে সাথে,
মন বলে 'কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা
মনে মনে'!
আমার প্রথম সৃষ্টি সুখ
তোমার হাতের সবুজ চারাটি
বাড়ায় ছোট্ট মুখ।
তোমার হাতে কোদাল ছিল
আমার হাতে জল
বললে ডেকে তুমি আমায়
'গাছ পুঁতবো চল'।
সেইতো আমার প্রথম খুশি
ভোরের প্রথম সুর,
'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' তাই
দুঃখ হলো দূর।

ভোরের সুর

চৈতালী মারিক

আমার কৈশোর বৈশাখী বাতাসে
আম কুড়োয় তোমার সাথে সাথে।
আমার একলা সময় তোমার কোলের কাছে শুয়ে
গল্প শোনে অবাক বিস্ময়ে
হঠাৎ যখন, যায় হারিয়ে
অন্ধকারে আলো
আঁধার মনে তুমিই তখন
আশার প্রদীপ জ্বালো।
ভোরের পাখি শুনিয়ে গেল
ঠাকুর বাবার সুর
দুঃখ হলো দূর গো আমার
দুঃখ হলো দূর।

হারিয়ে পাওয়া আলোটিকে
যত্নে প্রাণে রাখি
জুঁই শাখার প্রতি পাতায়
সুচিস্মিতা হাসি

বৈশাখের এই তপ্ত দিনে
জলভরা মেঘ হয়ে
স্নেহের ছায়া বুলিয়ো তুমি
আমার শ্রান্ত জীবনে।

ইং ১৯৮৭ সালে ১১ই ডিসেম্বর আমার বাবা স্বর্গীয় শ্রী মুরারী মোহন দাস প্রচন্ড পেটের যন্ত্রনা নিয়ে নাসিংহোমে ভর্তি হয়েছিলেন। পেট ফুলে গিয়েছিল। অপারেশন করার কথা ছিল। কিন্তু বেশি সুগারের জন্য অপারেশন করা গেল না। যদিও ওনার কোনদিন সুগার ছিল না। এত কষ্ট পাচ্ছিলেন যে বাঁচার আশা ছিল না। ডাঃ পি. কে. সেনকে জিজ্ঞেস করায় উনি ভাল হবার আশ্বাস দিতে পারেন নি। আমাদের বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছিল। আমরা শ্রী শ্রী বাবার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছিলাম। বাবার এত কষ্ট আমরা সহ্য করতে পারছিলাম না। আমার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী দেখল বাবার বুকের ওপর শ্রী শ্রী ঠাকুর বাবা বসে আছেন। তার মনে হল যে ঠাকুর বাবা যেন বলছেন 'আমি আছি তোদের ভয় কি'? তারপর স্টেরয়েড দেওয়া হল। ওষুধটা দিতেই ম্যাজিকের মত কাজ করল। পুরোপুরি সুস্থ্য হতে অনেকদিন সময় লেগেছিল।

শ্রী শ্রী ঠাকুরবাবা দেহরাখার পর ইং ১৯৭৫ সালে হুগলী আশ্রমে গিয়েছিলাম। তখন বৈশাখ মাস। গঙ্গাদার স্ত্রী অনুবৌদির কাছ থেকে শ্রী শ্রী ঠাকুরবাবার সম্বন্ধে শুনলাম। তখন ওনারা আশ্রমে থাকতেন। ঠাকুরবাবা একবার ছলনা করে আশ্রমে আসেন। মাথার চুল ছাঁটা। হাতে একটা বালা। এসে বললেন আমার তিনদিন খাওয়া হয়নি। বৌদি বোঝেননি উনি ঠাকুর বাবা। নাট মন্দিরে বসালেন। এক গ্লাস চা আনলেন। উনি ঝুলি থেকে একটা নারকেল মালা বের করলেন। তাতে চা খেলেন। পাঁপড় ভাজা দিলেন। তারপর রান্না করতে গেলেন। তিনদিন খাননি শুনে ওনার জন্য তিনকৌটো চাল নিলেন। রান্না হয়ে গেলে নাটমন্দিরে পাতা পেতে খেতে দিলেন। উনিতো তিন কৌটো চালের ভাত খেলেন, এমনকি ঠাকুরের ভোগ ও বৌদির ভাত খেয়ে নিলেন। খাওয়া হয়ে গেলেই বললেন 'পূরণ'। তখন বৌদির মনে হল বাবা ছাড়া আর কেউ নয়। হাতের বালাটাও রয়েছে। বৌদি ওনার হাত চেপে ধরে বললেন 'আপনি পাতা ফেলবেন না'। তবুও সেই সাধু পাতা ফেললেন। তারপর বৌদিকে বললেন 'যা খেতে যা'। বৌদি গেটে তালা দিয়ে চলে গেলেন। বড় মেয়েকে খেতে দিয়ে হাঁড়িতে দু'এককনা ভাত লেগেছিল তাই মুখে দিয়ে জল খেয়ে চলে এলেন। এসে তন্ন তন্ন করে খুঁজে পেলেন না। গেটের চাবি খুলে সামনের ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন কেউ কোন সাধুকে যেতে দেখেছে কিনা? কেউই দেখেনি।

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূ পজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্চায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে"।। গীত

বাংলা অনুবাদ —

'বিষয় সমূহ চিন্তা করিতে করিতে তৎসমুদয়ে মানুষের আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে ক (তৃষ্ণা) হয়, কামনা প্রতিহত হইয়া ক্রোধে পরিণত হয়।'

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ"।। গী

বাংলা অনুবাদ —

'তুমি মদগত চিত্ত হও; আমার ভজনশীল ও পূজনশীল হও। কায়মনোবাক্যে আমাকে কর। এইরূপে মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে মন ও বুদ্ধি সমাহিত করিলে আমাকেই লাভ করি

"সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"।। গী

বাংলা অনুবাদ —

'সকল ধর্মাধর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র আমার শরণাগত হও। সকল ধর্মাধর্ম বন্ধ পাপ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব। অতএব, শোক করিওনা'।